

© 2021  
বিদেষ্ণ

**The real essence of Pujo**

*A designer saree or a hot samosa,  
the real pujo is always in our minds*

**We revive, we survive**

*As life gets back to normal,  
what changes us as human beings?*

Brought to you by

INDYANA



Perfectly covers  
your grey hair just  
in 10 minutes

No ammonia,  
Floral scent



Bigen  
*Speedy*  
CONDITIONING  
COLOUR

Easy and Speedy  
with Excellent  
Grey coverage



Bigen Men's  
*SPEEDY COLOUR*



Bigen Men's  
*BEARD COLOUR*

Beauty  
for your hair,  
Shine  
on your life.



Bigen  
PERMANENT  
POWDER  
HAIR COLOUR

Bigen

# স্মৃতিপত্র



## সম্পাদকের কলমে

পৃষ্ঠা ৪ জয় তব ভীষণ সব কলুষ-নাশন-রুদ্রতা  
শতরূপা বোস রায়

## গল্প

পৃষ্ঠা ৬ তোমার নাম ধরে কেউ ডাকে  
অরিজিৎ গাঙ্গুলী

পৃষ্ঠা ৩২ পি-৩-বি  
অগ্নিভ সেনগুপ্ত

পৃষ্ঠা ৪০ সপ্তমে সপ্তমী      পৃষ্ঠা ৪৯ আবাহন  
অর্চনা পাল      ভনিমা চ্যাটার্জী

## অভিজ্ঞতা

পৃষ্ঠা ৩৭ স্বপ্ন দেখতে আজো ভালো লাগে  
বিদিশা ব্যানার্জী

পৃষ্ঠা ৩৮ দাদা, আমরাও বাঁচতে চাই      পৃষ্ঠা ৪৮ লাউয়ের টচ আর ট্রেনের টিকিটের গল্প  
অরিন্দম চ্যাটার্জী      পলাশ সাহা

## প্রবন্ধ

পৃষ্ঠা ৪৫ রঙ্গমঞ্চ-বহুতা স্মৃতির কোলাজ  
প্রাণেশ চ্যাটার্জী

পৃষ্ঠা ৫২ ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও বর্তমান প্রজন্ম  
লিপিিকা ভট্টাচার্য

## মুখোমুখি

পৃষ্ঠা ৩৬ মগজাল বাঁধা পরেছে সরকারের কাছে  
চন্দন সেন

পৃষ্ঠা ৪৭ সহজভাবে বেঁচে থাকা সহজ  
চন্দ্রানী ও বিক্রমজিৎ ব্যানার্জী

## ভাষান্তরে

পৃষ্ঠা ৪৩ TEARS OF JOY  
MOUSUMI SINHA

পৃষ্ঠা ৫০ INTEGRATION: FINDING YOUR 'CLOGS'  
CHAITALI SENGUPTA

## আঁকিবুকি      পৃষ্ঠা ৫৪

# জয় তব ভীষণ সব কলুষ- নাশন- রুদ্রতা

শতরূপা বোস রায়

প্রতিদিন ভোর বেলা ঘুম ভেঙে উঠে সূর্য প্রণাম করে এক তলায় নেমে বাগানের দরজাটা খুলে একটা নতুন দিনের অভ্যর্থনা। এটাই আমার পরবাসের দৈনন্দিন। একটা প্রবাহ যা জীবনের উত্থান পতনের মধ্যে অপরিবর্তনীয়। এর মধ্যে আমি খুঁজে বেড়াই আমার মেয়েবেলার মুহূর্ত, আমি খুঁজে বেড়াই কাক ভোরের সেই ছোট্ট চড়াই, সদরের গঙ্গা জল, প্রথম চায়ের জল ফোটান টগবগ শব্দ। ধোঁয়া ওঠা চিনি দেওয়া গরম দুধের গন্ধ। এই বাসরেও তার অনেকটা যাপন করি আমি কিন্তু সে বড়ই যান্ত্রিক। ঘড়ির কাটার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি প্রহর যাপন। যার মধ্যে বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া প্রায় দুরূহ।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও ঘুম ভেঙে উঠে বাগানের দরজা খুলতেই চোখ পরল হঠাৎ বাগানে ফোটা কাশ ফুলগুলোর দিকে। প্রথম সূর্যের সোনালী আলোয় ঝক ঝক করছে। একটা ঠান্ডা হাওয়ার পরশ এসে লাগলো চোখে মুখে। কয়েকটা ম্যাগপাই রোজ ভোর বেলা জল খেতে আসে আমার বাগানে। সেই মাটির পাত্রে জল রাখতে গিয়ে কাঠের জুতো পায়ে গলিয়ে যখন বাগানে নামলাম মনে হলো একবার কাশ ফুলগুলো ছুঁয়ে দেখি। সদ্য জাতের প্রতি যেমন একটা আকর্ষণ জন্মায় ঠিক তেমনি আকর্ষণ অনুভব করলাম ওই সদ্য প্রস্ফুটিত আগমনীর ফুলগুলোর প্রতি। এই সময়টায় অন্য গাছগুলোয় পাতা ঝরার বেলা। গরমে লাগানো ফুলগুলোয় কিছু রং অবশিষ্ট তখনও কিন্তু বেশির ভাগ গাছেই পাতার মর্মর ধ্বনির মাঝে বিদায় বেলায় ক্রন্দন ধ্বনিত হয় যেন।

এ পরবাসে প্রকৃতির মধ্যে জীবনের আধার খুঁজে পেতে চাইলে হয়তো বা পাওয়া যায়। একটা প্রাত্যহিকতার মাঝে নিজেকে বেঁধে রাখলেও প্রকৃতির কাছে যেন জীবনের সব আগল খুব সহজে খুলে যায়। প্রকৃতির রং নিজের জীবনকেও রাঙিয়ে দিয়ে যায় নিজের অজান্তে। তাই তো সদ্য ফোটা ফুলগুলো দেখে সৃষ্টির উদ্যম উল্লাসে দিনের সূচনা করলাম। কিছুই যে বদলায় না। এই অতিমারীর সময়, একরাশ দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তা নিয়ে কবে কখন কিভাবে যে প্রকৃতির কাছে আশ্রয় নিয়েছি আমি নিজেও টের পাইনি। এই সদ্য প্রস্ফুটিত কাশের গুচ্ছ আমায় মনে করিয়ে দেয় প্রতিবার আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের সূচনার কথা, কিন্তু কেন যেন এবারে এই ফুল গুলোর মধ্যে উৎসবের ঘ্রান অনুভব করলাম না, অনুভূত হল এক অবিদ্যমান সত্য। এতো প্রকৃতিরই অর্ঘ, সেই আদি শক্তিকে ধরায় অবতীর্ণ করতে প্রকৃতিও যে সেজে ওঠে। হয়তো সেটাই পরম সত্য। প্রকৃতি যে সকল শক্তির আধার, প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত বহুমানতার শক্তি? প্রতিদিনের সূর্যোদয়, পূর্ণ চন্দ্র, গহন অমাবস্যা এসবই তো প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি।

ভোরের স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ মনে হল এবারেও পূজোর যৎসামান্য জাঁক জমকেও হেঁই রব নেই, সেই আগের উৎসাহ নেই। পূজো আসছে কিন্তু মনের মধ্যে এখনো যেন একটা ভয়। কিন্তু প্রকৃতি যে নিরলংকার ভাবে তার আগমনি বার্তা বহন করে এনেছে। এবারে বুঝি কেবল সেই শক্তি রূপিনী মাকে প্রকৃতির মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। মাতৃরূপিনী দেবীকে নিজের মধ্যে মন্বন করতে হবে। এবারে বুঝি সেই সময় এলো যখন পূজোর আসন সাজাতে হবে অন্তরে, অঞ্জলি দিতে হবে প্রকৃতির পায়ে। মন্ত্রোচ্চারণে জ্বালিয়ে তুলতে হবে মানুষের মধ্যে সেই উজ্জ্বল আলো, যা সৌভ্রাতৃষ্ণের, আবেগের, ভালোবাসার, কাছে থাকার, পাশে থাকার আশ্বাস নিয়ে আসবে।

এবারের পূজো হোক না একটু অন্য রকম। এবারে পূজোয় দেওয়া হোক অঞ্জলি অন্তরে। আমাদের প্রাত্যহিক দুর্নিবার ছুটে চলার মোহে, অপরকে খাটো করে এগিয়ে চলার মোহে আমরা যে ক্রমশ অন্ধকারেই নিমজ্জিত হয়েছি। এই সুধা সাগরের তীরে বসে শক্তির আরাধনার নামে কেবলই যে কোলাহল করে এসেছি আমরা এতগুলো বছর ধরে। জাঁক জমক, অর্থের জৌলুশ, পার্থিব আদান প্রদানে শক্তি রূপিনী দেবী মহিমা প্রকাশ পায় কতটা জানি না, আমরা ক্রমশ তলিয়ে যাই এক নিবিড় অন্ধকারে।

এ পূজায় এই তমসাম্বল অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে নিজের মধ্যে শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষ যে আজ বড় দিশাহারা। পৃথিবী জুড়ে শোক তাপের মধ্যে জীবনকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

এই দুর্দিনে চারিপাশে তাকালে শুধুই যে মানুষের হাহাকার। বিশ্বজুড়ে মৃত্যু মিছিল। ভারতবর্ষে হাজার হাজার মানুষের হত দরিদ্র অবস্থা। চাকরি নেই, সংস্থান নেই, খাবার নেই, মাতৃ রূপিনী দেবী দুর্গা এবারে হয়তো বা শুধু উৎসবের মহিমায়, উজ্জাপনের মহিমায় প্রকাশ পাবেন না, তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে নিজের মধ্যে। যাতে এই মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমরা তাদের নিভে যাওয়া জীবনে উৎসব পালনের আলো জ্বালাতে পারি। মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি, সৌভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি।

এ বছর পূজা হোক আরোগ্য কামনার পূজা। হোক বিশ্বাসের পূজা। এ পূজা হোক মঙ্গল কামনার পূজা। শুধু জনকল্যাণ নয়, এ পূজায় মন্ত্র হোক আত্মার শুদ্ধির, শুভ কামনার। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার। এ পূজায় মন্ত্র হোক অন্তরের কলুষতা বিনাশের, মনের কোণের সেই নিশ্চল বিনাশের। এ পূজা হোক শুভ সময়ের উজ্জাপনের পূজা।

নমস্তে রুদ্ররূপিন্যৈ নমস্তে মধুমর্দিনী।

নমঃ কৈটভহারিন্যৈ নমস্তে মহিষাধিনী।।

নমস্তে শুষ্কহস্ত্র্যৈ চ নিশ্চলসুরঘাতিনী।।

জাগতং হি মহাদেবী জপং সিদ্ধং কুরুস্ব মে।

এংকারী সৃষ্টিরূপায়ৈ, হ্রীংকারী প্রতিপালিকা।।

ক্লীংকারী কামরূপিন্যৈ বীজরূপে নমোস্তু তে।

চামুণ্ডা চণ্ডঘাতী চ য়ৈকারী বরদায়িনী।

ভিষ্ণে চাভ্যদা নিত্যং নমস্তে মন্ত্ররূপিণি।।

ধাং ধীং ধুং ধূর্জটেঃ পল্লী বাং বীং বুং বাগদীশ্বরী।

ক্রাং ক্রীং ক্রুং কালিকা দেবী শাং শীং শুং মে শুভং কুরু।।

হং হং হংকাররূপিন্যৈ জং জং জং জম্বনাদিনী।

# তোমার নাম ধরে কেউ ডাকে

## অরিজিৎ গাঙ্গুলী

– তুই কি সত্যিই ভূত দেখতে পাস?

আচমকা এই প্রশ্নে বিষম লেগে ব্র্যাটের হাত থেকে জলের গ্লাসটা আর একটু হলেই পড়ছিল। সুদেবের বউ তিস্তা এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে ফুঁ দিতে একটু ধাতস্ব হয়েই ব্র্যাট বলল,

– প্রশ্নটা এমন স্ট্রেটকাট করবি ভাবতে পারিনি সুদেব!

– ওহো, কেন বল তো! আমাকে তো কলেজ অ্যালামনি গ্রুপের অনেকেই বলল যে তোর নাকি এখন একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। তুই নাকি তেনাদের দেখতে পাস, কথা বলিস।

– বাপরে, সবাই মিলে গল্পের গরু তো গাছে তুলে দিয়েছে! এসব কথা কি আমার পিছনেই শুধু করে ওরা? কই, আমাকে তো কোনোদিন জিজ্ঞেস করেনি। তুই অবশ্য করলি আজ।

– বল না, তুই কি সত্যিই দেখতে পাস।

ব্র্যাট দু আঙুল দিয়ে পঁপের চাটনির শেষটুকু খালা থেকে চেটে নিয়ে চেয়ারের পিছনে গা এলিয়ে বলল,

– সে বলতে গেলে অনেক গল্প। রাতের আড্ডার জন্য কিছু তো রাখ। তবে তিস্তা, তোর হাতে যাদু আছে মাইরি! প্রত্যেকটা রান্না লাজবাব বানিয়েছিস রে। আহা, মন ভরে গেল।

তিস্তা প্লেট তুলতে তুলতে বলল, "যাক, আমি টেনশনে ছিলাম সকাল থেকে। এতদিন পর আমাদের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে, যে আবার ছোট থেকেই পেটুক। বারবার নেমন্তন্ন করার পর অবশেষে এলি। তবে এবার শান্তি। তোরা উঠে পড়। বড় বারান্দায় গিয়ে বোস, ভালো হাওয়া পাবি। আমি এদিকটা গুছিয়ে আসছি।"

সুদেব আর ব্র্যাট বেসিনে হাত ধুয়ে বারান্দায় রাখা দোলনা সোফায় গিয়ে বসল।

– জমপেশ ক্ল্যাটটা কিনেছিস সুদেব। দশ তলায় দু'খানা দখিন খোলা বারান্দা, মৃদুমন্দ বাতাস, আহা রোম্যান্টিক! কবে হ্যান্ডওভার পেলি যেন? শুনছিলাম তো তিন বছর আগেই বুক করেছিলিস।

– হ্যাঁ, অনেকদিন ঝুলিয়ে এই চার মাস আগেই প্রোমোটর চাৰি দিল। মাঝখানে কিছু গুণ্ডোগলে বেশ কয়েক মাস কাজ বন্ধ ছিল। কেন যে ছিল ভগবান জানে! তখন অবশ্য আমাকেও অফিসের কাজে ব্যাঙ্গালোর যেতে হয়েছিল কয়েক মাসের জন্য। তারপর ফিরে এসে তাড়া দিয়ে দিয়ে ফাইনালি পেলাম। তবে মনের মতো জায়গা এটা। তিস্তারই পছন্দ বলতে পারিস।

– তিস্তার একটা পছন্দই শুধু ঝুল, বাকিগুলো সেরা।

– ক্যালানি খাবি!

এরই মধ্যে তিস্তাও ওর রান্নাঘরের কাজ সেরে এসে বসল সুদেবের পাশে। মৌরির কোটো থেকে সবাইকে একটু করে হাতে ঢেলে দিয়ে বলল,

– আমার নাম দিয়ে চালাচ্ছে রে এখন ব্র্যাট। ও নিজেই এই ক্ল্যাটটা নেওয়ার জন্য সাধাসাধি করত আমায়। এই লোকেশন ওর কেন যে এত পছন্দ হল, ভগবান জানে। আমার ইচ্ছে ছিল না প্রথমদিকে। সুদেব হেব্বি ব্রেনওয়াশ করত আমায় রোজ। তবে এখন আমার খারাপ লাগে না অতটা। এত খোলামেলা আর পাওয়া যেত না। তবে... আচ্ছা, তোর এই ব্র্যাট নামটা তো দেখলাম গ্রুপে অনেকেই জানে না। ব্রতীন্দ্র ব্রতীন্দ্র বলেই ডাকে।

- আরে জুনিয়র ওরা, সাহস পায় না।
- তোর গার্লফ্রেন্ড সাহস পায়?
- কোন গার্লফ্রেন্ডের কথা বলছিস বল তো? দাঁড়া লিস্ট বার করি।

তিস্তা পাশে রাখা ছোট বালিশ ছুঁড়ে মারল ব্র্যাটের দিকে, "তুই আর বদলালি না! যাকগে, এবার বল তোর ভূতদের কথা।"  
সুদেবও বলে উঠল, "হ্যাঁ, ভালো মনে করিয়েছ তিস্তা। বল বল। তারপর আমাদেরও একটা সিক্রেট তোকে বলব।"

সুদেবের মুখে এই সিক্রেটের কথা শুনেই তিস্তার মুখ থেকে হাসিটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। ব্র্যাটের চোখ খুব তীক্ষ্ণ। এড়াল না তিস্তার এই আকস্মিক মুড চেঞ্জ।

- কী ব্যাপার বল তো তিস্তা? তোদের আবার কী সিক্রেট? গুড নিউজ আসছে নাকি?
- আরে না না। বলব খন। আগে তোর কথা বল।

ব্র্যাট ছোট বালিশটা বুকের কাছে জড়িয়ে আয়েশ করে বসল। তারপর বলল,

- আমার কেসটা খুব সিম্পল। তোদের মনে আছে আজ থেকে চার বছর আগে আমার সেই বাইক অ্যাক্সিডেন্টের কথা?
- মনে করাস না প্লিজ! সে যে কী সময় গিয়েছিল আমরাই জানি। তোকে ফিরে পাব আবার ভাবতেই পারিনি।
- হুমম, খুব কঠিন সময় ছিল সেটা। নয়তো দুদিন কোমাতে থাকার পর এইভাবে বেঁচে ফিরে আসা মিরাকল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আমার বোধহয় ভাগ্যে মৃত্যু লেখা ছিল না তখন। আর কোমা থেকে আমার এইভাবে ফিরে আসাই হচ্ছে তোদের প্রশ্নের উত্তর।

সুদেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মানে? বুঝলাম না! ওই ঘটনার সঙ্গে তোর এই নতুন ক্ষমতার কী সম্পর্ক?"

- সম্পর্ক আছে রে। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। চার বছর আগে সেইদিন প্রায় ঢুকেই পড়তে যাচ্ছিলাম তেনাদের দুনিয়ায়। কিন্তু কোনও দৈববলে বেঁচে ফিরে আসি। তাই তেনারা বোধহয় এখনও আমাকে ওদেরই লোক ভাবেন। সেইজন্যই একটু দেখা সাফাৎ দেন আমাকে মাঝেমাঝে। হা হা..

তিস্তা রেগে গিয়ে বলল, "উফ, তোর সবচেয়েই ইয়ার্কি! বানাতেও পারিস বটে গল্পগুলো। বল না আসল কারণটা।"

- আরে সিরিয়াস, আমি নিজেও জানি না এর আসল কারণ কী! কিন্তু সেদিন নতুন জীবন পাওয়ার পর থেকেই আমি বুঝেছিলাম যে দুই দুনিয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকে, তার ঠিক মাঝখানে যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি। ব্যাপারটা কিন্তু খুব সুখদায়ক নয় কিন্তু। প্রথমে খুবই ভয় পেতাম। কিন্তু পরে সয়ে যায় আস্তে আস্তে। আর এই ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করি মানুষদের একটু সাহায্য করতে। অবশ্য যদি দরকার পড়ে তবেই।

– তোর তো গুগাবাবার কেস রে! ভূতের রাজার বরের জোরে পরের ভূত ছাড়াস।

- হা হা, বলতে পারিস। তবে ভূতের রাজাটিকে দেখার সৌভাগ্য আমার এখনও হয়নি। প্রজা অনেক দেখেছি।

তিস্তা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ভূতের রানীকে দেখতে পেলে তোর গার্লফ্রেন্ডের লিস্ট অ্যাড করে নিস। আচ্ছা, তোরা দুই বন্ধুতে জমিয়ে সারারাত গল্প কর, সুরাপান কর, আমি আর জেগে থাকতে পারছি না রে, অনেক সকালে উঠেছি। শুতে চললুম। গুড নাইট!"

ব্র্যাট উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যালুটের ভঙ্গীতে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম!"

মুখ বেঁকিয়ে হেসে তিস্তা চলে গেল ভেতরে। ব্র্যাট শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে বসে বলল, "এবার তোদের ঘটনাটা বল সুদেব, যেটার জন্য আমাকে ফোন করেছিলিস। তিস্তাকে আমার আসার কারণ বলিসনি বুঝতেই পারছি। ভালো করেছিস।"

- হুমম, শোন তাহলে সব খুলে বলি তোকে। তার আগে দাঁড়া পেগ বানিয়ে নিই। স্কচ চলবে তো?
- দৌড়বে! অন দ্য রক্স।
- ওকে! আচ্ছা একটা কথা বল ব্র্যাট। যদিও আমার এইসব আজগুবি ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, তবুও তোর অদ্ভুত শক্তির যাচাই করে দেখতে ইচ্ছে করছে। আমাদের ক্ল্যাটে অস্বাভাবিক কিছু দেখলি? মানে তোর তো চোখে পড়ার কথা।
- সেইভাবে খেয়াল করিনি তো! এই ক্ল্যাটেই কেস নাকি? বলিস কী?
- কেস কিনা জানি না, যা ঘটেছে সেটাই তোকে বলি তাহলে শোন।

দুজনেই টেবিলের সামনে রাখা গ্লাস তুলে চিয়াস বলে চুমুক দিল। হাতে গ্লাস ধরেই বলতে শুরু করল সুদেব।

"এই ক্ল্যাটটা আমরা হ্যান্ডওভার পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই এখানে শিফট করি। নতুন জায়গা, নতুন স্বপ্ন, বেশ ভালোই কাটছিল। আমি আর তিস্তা কেউই পূজো আচ্ছায় বিশ্বাস করি না। তাই গৃহপ্রবেশের পূজোও কিছু করিনি। দুপক্ষেই বাবা মা না থাকলে যা হয়, কেউ বলারও ছিল না। তুই তো আমাকে আর তিস্তাকে অনেক আগে থেকেই চিনিস। তিস্তার মতো এনার্জেটিক মেয়ে আর দেখবি না। সারাক্ষণ হাসিখুশী থাকতে ভালোবাসে। ইস্যু নেওয়ার প্ল্যান এখনও করিনি আমরা। সব মিলিয়ে শান্তিপূর্ণ একটা জীবন। কিন্তু হঠাৎ কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল এখানে আসার পর থেকেই।"

ব্র্যাট বলল, "মাঝখানে কাটব না, তুই বলে যা, শুনি।"

সুদেব বলতে থাকল।

"কমপ্লেক্সে এখনও বেশিরভাগ ক্ল্যাটই বিক্রি হয়নি। এর কারণ হিসেবে লোকেশন বলতে পারিস। বাসস্ট্যান্ড বা স্টেশন থেকে এটা একটু ভিতরের দিকে। অবশ্য সেই কারণে এর দামও অন্যদের থেকে কম। আমার কিন্তু এই ফাঁকা নিরিবিলি জায়গাটাই বেশ পছন্দ হয়েছিল। শহরের কোলাহল থেকে একটু দূরে থাকতে চেয়েছিলাম যেখান থেকে একমুঠো খোলা আকাশ দেখা যায়।"

"তিস্তা আর আমার দুজনেরই একটু রাত করে শোওয়ার অভ্যেস। নতুন ক্ল্যাট সাজানোর কাজও আমরা ডিনারের পরেই করতাম। এই ডাইনিং রুমের লাগোয়া বারান্দাটা বড়। আরেকটা বারান্দা আছে আমাদের শোওয়ার ঘরের সঙ্গে। সেটা একটু ছোট। প্রথম ঘটনাটা ঘটল ক্ল্যাটে আসার দু সপ্তাহের মাথায়।"

"সেদিন রাতে বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। তার সঙ্গে মুহুমুহ বাজের আওয়াজ। বাজ পড়লে তিস্তা বেশ ভয় পায়। খাওয়াদাওয়া আর ঘর সাজানো সেরে আমরা শুতে গেলাম রাত একটা নাগাদ। ক্লান্তিতে খুব তাড়াতাড়িই আমার ঘুম এসে গেল। কিন্তু মাঝরাতে আচমকা বিদ্যুতের ঝলকানি আর বাজের শব্দে আমার ঘুম ভাঙতেই চোখ খুলে দেখি তিস্তা পাশে নেই। বাইরে এত বাজ পড়ার আওয়াজের মধ্যে তিস্তার তো একা একা বাথরুম যাওয়ার কথা নয়। আমাকে না ডেকে তুলে মেয়েটা কোথায় গেল ভেবে আমি বিছানার ওপর উঠে বসলাম। বৃষ্টি তখনও একনাগাড়ে পড়ে যাচ্ছে। অন্ধকার ঘরে কিছু দেখা যাচ্ছিল না তেমন। কিন্তু একটা বিদ্যুতের চমকানির আলোয় হঠাৎ মনে হল ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে তিস্তা দাঁড়িয়ে। এরকম ঝড়জলের রাতে ওখানে একা দাঁড়িয়ে কী করছে ও! এই ভেবে খাট থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম ব্যালকনির দরজার দিকে। দরজাটা খুলতেই চমকে গেলাম!"

"ব্যালকনিতে কোমর সমান চারটে সমান্তরাল লোহার রড দিয়ে তৈরি রেলিং। সেই রেলিং-এর ওপর অর্ধেকটা উঠে তাতে দাঁড়িয়ে আছে তিস্তা। কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ঝুঁকে আছে বাইরের দিকে। যেকোনও মুহূর্তে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে ভেবে আমি "তিস্তা" বলে চঁচিয়ে আগেই ওকে পিছন থেকে গিয়ে জাপটে ধরলাম। তিস্তা চমকালো না। অজ্ঞান হয়ে আমার কাঁধে এলিয়ে পড়ল। কোনোরকমে ওকে ধরে ঘরে এনে শুইয়ে দিলাম। ব্যালকনির দরজাটা বন্ধ করার সময় কী মনে হল একবার রেলিং-এর কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ঝড়বৃষ্টির তাগুবে এত ওপর থেকে নিচের দিকে ভালো করে দেখাও গেল না। উপরন্তু বেশ ভালোই ভিজে ঘরে ফিরে এলাম। তিস্তা ঘুমিয়ে পড়েছিল।"



"সকালে উঠে আগের রাতের কথা তিস্তার কাছে জানতে চাইতেই ও অবাক হয়ে তাকালো। দেখলাম কিছুই মনে নেই ওর। তাই আর ঘাঁটলাম না। কিন্তু আরেকটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম তার পরের কয়েকদিন ধরে। প্রথমে তিস্তাই দেখালো রাতে খেতে বসার সময়। ওর হাতের কব্জিতে দেখি তিনটে সমান্তরাল আঁচড়ের দাগ। নখ দিয়ে আঁচড়ানো মনে হল না। অদ্ভুত রকমের সোজা সেই দাগগুলো। যেন মাপ করে বসানো। তবে তিস্তা যেটা বলল সেটা শুনে আমারও বেশ অদ্ভুত লাগল। দাগ তিনটে নাকি একসঙ্গে দেখেনি ও সেদিন। বরং প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা করে দাগ পড়তে দেখেছে। বিশ্বাস করিনি ওকে জানিস তো ব্র্যাট। কিন্তু পরেরদিন সকালে উঠে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম ওর হাতে চার নম্বর আঁচড়ের দাগটা দেখে। তিস্তা কেমন একটা আনমনা হয়ে গেল সেদিন থেকেই। ভয়ও পেয়ে গেল ভেতর ভেতর। রাতে শোওয়ার সময় হাতের কব্জিতে রুমাল দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে কব্জলের তলায় হাত ঢুকিয়ে শুতে গেল সেদিন রাতে। ঘুম আসছিল না ওর কিছুতেই। আমার তেমন ভয়ডর লাগে না এসবে। তিস্তাকেও তাই বোঝাচ্ছিলাম এটা মনের ভুল। চামড়ায় কোনও সমস্যা হয়েছে। ডাক্তার দেখিয়ে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিস্তা মন দিয়ে শুনছিল না। খালি তাকাচ্ছিল ব্যালকনির দিকে। কারণ জিজ্ঞেস করতেও কিছু বলতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল আস্তে আস্তে।"

"পরেরদিন সকালে উঠেই আমার মনে হল সত্যিই এবার ডাক্তার দেখানো দরকার। কারণ তিস্তার কব্জিতে পাঁচ নম্বর দাগটাও জ্বলজ্বল করছিল। অফিস ছুটি নিলাম সেদিন। একজন নামকরা ডার্মাটোলজিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তিস্তাকে দেখালাম। উনি ঘটনার বর্ণনায় পাত্তা না দিয়ে একটা মলম আর রাতে শোওয়ার আগে খাওয়ার জন্য একটা ট্যাবলেট দিলেন। সঙ্গে আশ্বাস দিলেন যে দাগ মিলিয়ে যাবে আস্তে আস্তে। তিস্তা মনে একটু বল পেল পরেরদিন যখন দেখল আর নতুন আঁচড়ের দাগ পড়েনি। কিন্তু আগের পাঁচটা দাগ একইরকম ছিল।"

ব্র্যাট শুনছিল মন দিয়ে। এবার মুখ খুলল।

– সুদেব, একটা কথা বল। তিস্তাকে কি ওই ব্যালকনিতে আর কোনও রাতে যেতে দেখেছিস?

সুদেব গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল,

"হুমম, শোন না, এখনও শেষ হয়নি। এর বেশ কয়েকদিন পরের ঘটনা। অফিস থেকে ফিরতে আমার একটু দেরিই হল সেদিন। রাত নটা নাগাদ ফিরে দেখি লিফট কাজ করছে না। তিস্তাকে ফোন করলাম কিন্তু ও ধরল না। অগত্যা উঠতে শুরু করলাম সিঁড়ি দিয়ে। পাঁচতলা অবধি উঠেই হাঁপ ধরে গেল। প্রায় অন্ধকার করিডরেই দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। তারপর আবার উঠতে লাগলাম আস্তে আস্তে। দশতলায় এসে দেখি আমাদের করিডরের আলোটাও জ্বলছে না। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে এগিয়ে গেলাম আমার ফ্ল্যাটের দিকে। দরজায় এসে নক করলাম দুবার। কোনও সাড়া পেলাম না। তিস্তার নাম ধরে ডেকে আবার ধাক্কা দিলাম বেশ কয়েকবার। হট করে দরজাটা খুলে যেতেই চমক ভাঙল। ওটা আমার ফ্ল্যাট নয়। সম্পূর্ণ ফাঁকা আসবাবহীন একটা ফ্ল্যাট। অন্ধকার ঘরে বাইরের বারান্দা দিয়ে আবছা আলো এসে মায়ারী করে রেখেছে ভেতরের পরিবেশ। সত্যি বলতে আমারও কেমন একটু অস্বস্তি হল।"

"তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে মোবাইলের আলোটা করিডরের লিফট লবির সামনে ফেলতেই দেখি ওটা নয় নম্বর ফ্লোর। ওঠবার সময় এতটাও ভুল হওয়ার কথা নয় আমার। যাই হোক, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখলাম আমার করিডরের আলোটা জ্বলে গেল সেপ্তরের সাহায্যে। এবার আমার দরজায় নক করতে গিয়ে দেখি সেটা খোলা। তিস্তার নাম ধরে ডাকলাম, কিন্তু কোনও সাড়া এল না। ডাইনিং রুম ধরে এই বারান্দায় এলাম, ওকে দেখতে পেলাম না। হস্তদন্ত হয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকলাম। সেটাও ফাঁকা। ছোট ব্যালকনিতে গেলাম দরজা খুলে। সেখানেও তিস্তা নেই। বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। জোরে দু তিনবার তিস্তার নাম ধরে চৈঁচিয়ে ডাকলাম। কোনও উত্তর এল না। কী মনে হতে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে আবার ডায়াল করলাম তিস্তার নাম্বারে। কানে রিং হওয়ার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম তিস্তার ফোনের রিংটোনটা যেন খুব দূর থেকে আমার কানে আসছে। ছোট ব্যালকনি ছেড়ে ঘরে ঢুকলাম, বাইরের ডাইনিং রুমে গেলাম, বাথরুম আর বড় বারান্দায় দেখলাম, কিন্তু কোথাও ওর ফোনটা খুঁজে পেলাম না। রিংটোনের আওয়াজটাও এদিকে কম শোনা যাচ্ছে। আবার ফিরে এলাম ছোট ব্যালকনিতে। আওয়াজটা বাড়ল একটু। মনে হল ব্যালকনির বাইরে থেকে আসছে সেটা। রেলিং এর কাছে গিয়ে ঝুঁকে মুখ বাড়ালাম নিচের দিকে। রিংটোনের আওয়াজ আরও স্পষ্ট এখন। কিন্তু রিং বন্ধ হয়ে গেল।"

"আবার ডায়াল করলাম তিস্তার নাম্বারে। এবার রিংটোন শুনেই শব্দের উৎসের দিকে চোখ গেল। বিশ্বাস কর ব্র্যাট, আমার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন হিমেল স্রোত বয়ে গেল যখন মুখ বাড়িয়ে দেখতে পেলাম ঠিক আমার নিচের ব্যালকনিতে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে শুয়ে আছে একটা মেয়ে। পরনের পোশাকটা থেকে চিনতে পারলাম ওটা তিস্তাই। ওখান থেকেই চৈঁচিয়ে ডাকলাম তিস্তাকে। লাভ হল না কিছু। তিস্তা ওইভাবেই ঝুঁকে রইল নিচের ব্যালকনির সেই রেলিং থেকে। ওর হাতে ধরা ফোনটা বাজছিল, কিন্তু কোনও ক্রক্ষেপ ছিল না ওর।"

"পড়িমড়ি করে আমি আমার ফ্ল্যাটের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে শুরু করলাম। ন'তলার ফ্ল্যাটের সেই দরজায় এসে আরেকবার চমকে উঠলাম। ফাঁকা ওই ফ্ল্যাটের যে খোলা দরজাটায় আমি একটু আগেই ভুল করে এসে ঢুকে পড়েছিলাম, সেটা এখন ভেতর থেকে লকড। পাগলের মতো সেটাতে ধাক্কা মারতে শুরু করলাম তিস্তার নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে। নিরুপায় হয়ে বসে পড়লাম দরজার সামনে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ভয় পাওয়ার থেকেও আমার বেশি টেনশন হচ্ছিল তিস্তার যেন কোনও ক্ষতি না হয়।"

"মাথা ঠান্ডা করে এরপর মোবাইল বের করে তাতে কমপ্লেক্সের দারোয়ানের নম্বর খুঁজে বের করে ডায়াল করলাম। বিলাল বলে ছেলেটা ফোন ধরতেই ওকে বললাম যত তাড়াতাড়ি হোক যেন ন'তলার ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে ওপরে চলে আসে। কারণ জানতে চাইল ও। কিন্তু ধমক দিয়ে ওকে বললাম আগে ওপরে আসতে। দশ মিনিট কেটে গেল। আবার ফোন করতে যাব বিলালকে, ঠিক তখনই দেখি সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। আমি ওর হাত থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে দরজায় লক খুলতে শুরু করলাম। বিলাল একটু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল মনে হল, কিন্তু সেসব পাতাই দিলাম না তখন। দরজা খুলে অন্ধকার ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকেই ছুটে গেলাম সেই ছোট ব্যালকনিতে। কিন্তু আমার জন্য বিস্ময়ের শেষ হয়নি তখনও। সেই ব্যালকনিতে গিয়ে দেখলাম তিস্তা নেই সেখানে। বুক প্রচণ্ড ধুকপুক করতে শুরু করল। বারান্দা দিয়ে নিচের দিকে ঝুকলাম একটা অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখবার জন্য মনস্থির করে। কিন্তু অনেক নিচের ফাঁকা চাতালে কিছুই দেখতে পেলাম না। আর আমার মধ্যে দম অবশিষ্ট ছিল না। তিস্তার নাম ধরে চেঁচানোর মতো শক্তিও পাচ্ছিলাম না যেন আর।"

"মোবাইলটা আবার বের করে তিস্তার নম্বর ডায়াল করলাম ফ্ল্যাটের অন্য কোথাও ও আছে কিনা বোঝার জন্য। আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে মোবাইলের আওয়াজটা এল ওপরের তলায় আমার ব্যালকনি দিয়ে। কী মনে হতে আবার পিছনে ঘুরে ছুটে শুরু করলাম। বিলাল কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল আমাকে, কিন্তু ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। সজোরে আমার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে শোওয়ার ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি রেলিংয়ের গায়ে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে আছে তিস্তা। ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। ওকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে আর কিছুই তখন মাথায় ছিল না আমার।"

সুদেব ঘামতে ঘামতে টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে এক চুমুকে সমস্ত পানীয়টা গলায় ঢেলে দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তিস্তাকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি ভাই। ওর কোনও মানসিক রোগ হচ্ছে না তো?"

ব্র্যাট এগিয়ে এসে সুদেবের হাতে হাত রেখে বলল, "টেক কেয়ার রো। একটু রেস্ট নে। আমি ওয়াশরুম থেকে আসছি দাঁড়া।"

সকালে বেশ দেরিতেই ঘুম ভাঙল ব্র্যাটের। বাইরের বারান্দায় রাখা এই সোফায় দুলতে দুলতেই দুই বন্ধু কখন যে রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতেই পারেনি। সূর্যের আলোটা চোখে এসে পড়তেই উঠে বসল ব্র্যাট। সুদেবের সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু বেশিই পেটে পড়েছে কাল। মাথাটা ভালোই ধরে আছে। উঠে ঘরে ঢুকে দেখল সুদেব আর তিস্তা খাওয়ার টেবিলে বসে। তিস্তাই বলে উঠল,

– ওড মর্নিং ব্র্যাটবাবু! অতিথিকে বারান্দায় শোওয়ানোর জন্য সুদেবকে সকালেই খিস্তি মেরে দিয়েছি। এবার বল তোর কি লেবু জল লাগবে হ্যাঙ্গওভার কাটানোর জন্য?

ব্র্যাট মুচকি হেসে মাথা নাড়ল। চোখমুখ ধুয়ে এসে সুদেবের পাশে বসতেই তিস্তা গ্লাসে করে লেবুজল এনে রাখল ওর সামনে টেবিলে। আড়চোখেই ব্র্যাট লক্ষ্য করল তিস্তার হাতের কবজি। অদ্ভুতভাবে তাতে সমান্তরালভাবে আটখানা আঁচড় কাটা। তিস্তাকে বুঝতে না দিয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে সুদেবের দিকে তাকাল ব্র্যাট।

– আজ কী প্ল্যান তোদের সুদেব?

– কিছুই না। তুই এসেছিস, ব্যস উইকেন্ড জমে গেল। আমরা একা একা দুজনে মিলে একটু বোরই হই কাজ না থাকলে। তিস্তার ছোটমাসি সকালে ফোন করে নেমন্তন্ন করছিলেন আনন্দপুরে ওঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। তুই এসেছিস, এই বলে কাটিয়ে দিয়েছি।

– সে কী! কাটিয়ে দিলি কেন? আমার নতুন বাইকটা নিয়ে চলে যা না? তোদের চড়া হয়ে যাবে এই মওকায়।

তিস্তা পাশ থেকে বলল, "এই ব্র্যাট। তোর বাইকের দাম নাকি প্রায় তেরো লাখের কাছাকাছি। এত টাকা দিয়ে নতুন বাইক কিনলি কেন আবার। এবার তো একটা চার চাকা নিতে পারতিস আরামসে।"

– মজা নেই রে চার চাকায়। তাছাড়া আমার অ্যাক্সিডেন্টের পর ট্রমা কাটানোর জন্য ঠিক করেছিলাম আবার বাইকই ব্যবহার করব। আর হার্লে ডেভিডসনের স্বপ্নটা অনেকদিন ধরেই মনে পুষে রেখেছিলাম। আরেকবার মৃত্যুর মুখে যাওয়ার আগে মনে হল শখটা পূরণ করে নেওয়াই দরকার। তাই দুম করে বুক করে ফেললাম। ছমাসের মধ্যে ডেলিভারি দিয়ে দিল।

– মজা নেই রে চার চাকায়। তাছাড়া আমার অ্যাক্সিডেন্টের পর ট্রমা কাটানোর জন্য ঠিক করেছিলাম আবার বাইকই ব্যবহার করব। আর হার্লে ডেভিডসনের স্বপ্নটা অনেকদিন ধরেই মনে পুষে রেখেছিলাম। আরেকবার মৃত্যুর মুখে যাওয়ার আগে মনে হল শখটা পূরণ করে নেওয়াই দরকার। তাই দুম করে বুক করে ফেললাম। ছমাসের মধ্যে ডেলিভারি দিয়ে দিল।

– ওই ভট ভট আওয়াজ সহ্য হয় তোর? আমার তো মাথা ধরে যায়।

– তুই আর কী বুঝবি। ওটাই এনার্জি বুস্টার। রাজা মনে হয় নিজেকে। পক্ষীরাজ চড়ে উড়ে বেড়াই। চল তোদের একবার করে রাইড দিই।

"আজ থাক ব্র্যাট। আমি ভীতু মানুষ এখন," বলল তিস্তা।

ব্র্যাট তাকাল তিস্তার দিকে। জিঞ্জিৎস করল,

– তিস্তা, শোন। সুদেব আমাকে সবকটা ঘটনা বলেছে কাল রাতে। আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবি তুই?

তিস্তার মুখটা শুকিয়ে গেল এটা শুনেই। ঢোঁক গিলে বলল, "সুদেবকে বল না এই ক্ল্যাটটা চেঞ্জ করতে।"

সুদেব পাশ থেকে তিস্তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আমি আছি তো তোমার সঙ্গে। ভয় কীসের?"

ব্র্যাট জিঞ্জিৎস করল,

– তিস্তা, একটা কথা বল। খুব ভালোভাবে মনে করে দেখ তো রাত্রিবেলা তোর ওই ব্যালকনিতে যেতে কেন ইচ্ছে করে? জানি তোর ঘটনাগুলো ভাবতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু একটু চেষ্টা কর।

তিস্তা আনমনে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "কিছু মনে আসছে না রে। আমি যে ওই ব্যালকনিতে যাই, সেটাও আমি জানি না। সকালে উঠে সুদেব আমাকে বললে বুঝতে পারি। তবে হাতের এই দাগগুলো দেখলে খুব ভয় লাগে। ডাক্তারের দেওয়া মলম লাগিয়েও যাচ্ছে না। ছোটবেলায় মা বলত হাতে এঁটো লেগে থাকলে নাকি মাঝরাতে শয়তান এসে আঁচড়ে যায়। এটা কি সেরকম কিছু রে ব্র্যাট?"

– ধুস ওসব কিছু না। মন দিস না হাতের দিকে। ডাক্তারের কথা শুনে যা, দেখবি ঠিক সেরে যাবে। তোদের এই ফ্লোরে তো আরও দুটো ক্ল্যাট আছে। সেগুলোও কি খালি?

সুদেব উত্তর দিল,

– হ্যাঁ রে। আমাদের ওপর আর নিচের তলাও খালি। সাততলায় একটা ফ্যামিলি আছে জানি। তার নিচের তলাগুলোতেও আছে মনে হয়। এর বেশি জানি না।

– দারোয়ান বিলাল কি চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি দেয়?

– হ্যাঁ, ওর একটা ঘর আছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, সেখানেই থাকে।

– আচ্ছা। একটা অনুরোধ করব তোদের আজকে? প্লিজ না বলিস না।

সুদেব আর তিস্তা একে অপরের দিকে তাকালো একবার। সুদেবই বলল, "বল না, তোর সব অনুরোধেই আমরা রাজি।"

– তোরা আজকে দুজনে মিলে তিস্তার ছোটমাসির বাড়ি চলে যা। কাল ফিরিস। তোদের বাড়ি আমি পাহারা দেব।

তিস্তা বলে উঠল, "কী পাগলের মতো কথা বলছিস ব্র্যাট? তোকে ফেলে আমরা চলে যাব? এতদিন বাদে দেখা তোর সঙ্গে। একসাথে সময় কাটাও কোথায়, তা না!"

– তিস্তা, কথাটা শোন। আমাকে তোদের ক্ল্যাটে একটা রাত একা থাকতে দে। আশা করি কেন বলছি তা বুঝতে পারছিস।

তিস্তা হাঁ করে তাকিয়ে রইল ব্র্যাটের দিকে। সুদেব পাশ থেকে বলল, "তুই নিশ্চিত ব্র্যাট? আমার কিন্তু এটা তোর পাগলামো মনে হচ্ছে।"

– তুই বুঝবি না সুদেব। তোরা রেডি হয়ে নে। আমার বাইক নিয়েই চলে যা।

– না না, তোর বাইক আমি চালাতে পারব না। ট্যাক্সি নিয়েই যাচ্ছি তাহলে। রেডি হয়ে নাও তিস্তা। ব্র্যাট একবার জেদ ধরলে মনে হয় না আর শুনবে বলে। ও সারাদিন আরাম করুক বরং। আমরা ঘুরে আসি।

ব্র্যাট হাসল। তিস্তা আর সুদেব আধঘন্টার মধ্যে রেডি হয়ে ব্র্যাটের হাতে ক্ল্যাটের চাবি দিয়ে বেরিয়ে যেতেই ব্র্যাট ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঠিক দুপুরবেলা ভূতের ঠেলা খেতে হয়নি কোনোদিন ব্র্যাটকে। তাই আরাম করে চান খাওয়া করে নিয়ে ক্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে বাইরের করিডরে বেরলো ব্র্যাট। লিফটের বাটন প্রেস করতেই দরজা খুলে গেল। দশতলাতেই দাঁড়িয়েছিল তার মানে এটা। অথচ এই তলাতে তো কারুর আসার কথা নয়। লিফটে ঢুকে জি বাটন প্রেস করে নিচে নামল। গ্রাউন্ড ফ্লোরে গ্যারেজের পাশেই বিলালের ছোট ঘর। সেইদিকেই ব্র্যাট এগিয়ে গেল। ওকে দেখতে পেয়েই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বছর পঁচিশের একটা ছেলে।

– তোমার নামই কি বিলাল?

– জি হাঁ, কাহে বোলিয়ে?

– তোমার দেশ কোথায়?

– রাঁচি। কিঁউ?

– এখানে সব ক্ল্যাটের মালিকদের তুমি চেন?

– জি হাঁ, মোটামুটি সোবাইকেই চিনি। লেकिन আপকো তো...

– আমি দশ তলার ক্ল্যাটের সুদেব চক্রবর্তীর বন্ধু।

– সুদেব সাব? আচ্ছা সমঝো! উওলোগ তো কাঁহি ঘুমনে চলে গ্যায়ে।

– জানি। এই কমপ্লেক্সের মালিক কে? নাম জানো?

– জি বিলকুল। রাকেশ সামন্ত।

– রাকেশবাবু থাকেন কোথায়?

– দূর আছে থোড়া হিয়া সে। আজমতলা-কে पास।

– উনি আসেন এখানে?

– নাহ, পেহলে আতে থে। আভি বহত মহিনে হো গ্যায়া নেহি আয়ে।

ব্র্যাট আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বিলালকে হাত নেড়ে এগিয়ে গেল কমপ্লেক্সের ফাঁকা চাতালের দিকে। চোদ্দতলা বিল্ডিংয়ের ওপরের দিকে তাকালো। সারি সারি ব্যালকনি। নিচের দিকেরগুলোয় কয়েকটাতে কাপড়জামা মেলতে দেওয়া আছে রোদে। কিন্তু সুদেবের কথামতো সাত আটতলার পর থেকে ফাঁকাই মনে হচ্ছে। দশতলায় সুদেবের ব্যালকনির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ব্র্যাট। তারপর মাথা নামিয়ে হাঁটতে শুরু করল লিফট লবির দিকে।

ওপরে ওঠার বাটন প্রেস করতেই লিফটটা নয় তলা থেকে নামতে শুরু করল। দরজাটা খুলতেই ব্র্যাট দেখল ভেতরে একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। কিন্তু নিচে এসেও উনি বেরোলেন না লিফট থেকে। একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভুল করে নিচে এসে গেছেন হয়তো। ব্র্যাটও ঢুকে লিফটের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে দশ নম্বর প্রেস করল। লিফট ওপরে উঠতে শুরু করল, কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রমহিলা কোনও বাটনই প্রেস করলেন না। ব্র্যাট একটু অবাক হয়ে এবার জিজ্ঞেস করল, "এক্সকিউজ মি, আপনিও কি টেনথ ফ্লোর যাবেন?" সবুজ শাড়ি পরিহিতা বছর তিরিশের বিবাহিতা ভদ্রমহিলা একইভাবে সামনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

দশ তলায় লিফ্ট এসে থামতেই ব্র্যাট নেমে দাঁড়াল। কিন্তু ভদ্রমহিলা নামলেন না। দরজাটা আপনা হতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। ব্র্যাট কৌতুহলবশত তাকিয়ে রইল লিফ্টের দরজার ওপর ফ্লোর নম্বরের ডিজিটাল প্যানেলের দিকে। দেখল লিফ্ট আবার নিচে নামতে শুরু করেছে। থামল একেবারে গ্রাউন্ড ফ্লোরে গিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ সেখানেই থেমে রইল। ব্র্যাট হাত দিয়ে আবার বাটন প্রেস করল ইচ্ছে করে। ওর কেন জানি না মনে হচ্ছে সেই মহিলা এখনও আছেন লিফটে। ডিজিটাল প্যানেলে দেখা যাচ্ছে লিফট উঠে আসছে আস্তে আস্তে ছয়, সাত, আট, নয় করে। নয় তলায় থামল সেটা। বেশ অবাক হয়ে গেল ব্র্যাট। চকিতে সে সিঁড়ি ধরে নামতে থাকল নয় তলায় লিফট লবিতে। দেখল লিফটের দরজা খুলছে। মনে হচ্ছিল ভেতর থেকে কেউ এবার বেরবে। কিন্তু কাউকে বেরতে না দেখে ছুটে লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ব্র্যাট। দেখল ভেতরে কেউ নেই। দরজাটা বন্ধ হয়ে সেটা ওপরের ফ্লোরে গিয়ে দাঁড়াল।

কিছুটা অবাক হয়েই ব্র্যাট এবার ওই ফ্লোরেই সুদেবদের ফ্ল্যাটের ঠিক নিচের ফ্ল্যাটের দরজাটার সামনে এগিয়ে গেল। হাত দিয়ে দরজায় চাপ দিয়ে দেখল ভেতর থেকে বন্ধ। ফ্লোরটা বড়ই নিরুমা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে সুদেবের ফ্ল্যাটে ঢুকল ব্র্যাট। দুপুরে একটা ঘুম দিয়ে নিলে হয়, তাহলে রাতে জাগা যাবে। এই ভেবে শোওয়ার ঘরের বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিল।

রান্নাঘরে বাসন পড়ার ঝনঝন শব্দে হঠাৎ ঘুম ভাঙল ব্র্যাটের। বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। কোনোরকমে চোখ খুলে বিছানায় পড়ে থাকা মোবাইলটা হাতড়ে নিয়ে সেটা খুলে নিয়ে দেখল রাত সাড়ে নটা বাজে। এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল ও নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এত ঘুম এল কোথা থেকে! ঘুমপাড়ানি জায়গা মাইরি, মনে মনে ভাবল ব্র্যাট। রান্নাঘর থেকে এখনও শব্দ আসছে কিছু। পড়ে যাওয়া বাসন গুছিয়ে রাখছে কেউ। তিস্তারা ফিরে এল নাকি!

ব্র্যাট খাট থেকে নেমে উঠে দাঁড়াল। শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে কিচেনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখল মেঝেতে কোনও বাসনই পড়ে নেই। সব আগের মতোই সাজানো বিভিন্ন তাকে। বাঁদিকে ডাইনিং রুমের শেষ প্রান্তে বড় ব্যালকনিতে দেখল সোফাটা দুলছে। চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকাল ও। হাওয়াতে এতটা দোলার তো কথা নয় অত ভারী একটা দোলনার! মনে হচ্ছে কেউ যেন বসে রীতিমতো দোল খাচ্ছে তাতে। ব্র্যাট ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে লাগল ব্যালকনির দিকে। কাছাকাছি আসতেই একটা অদ্ভুত জিনিস হল। দোলনাটা দুলতে দুলতে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। কিন্তু না দোলা অবস্থায় যেভাবে থাকার কথা সেভাবে নয়, সামনের দিকটা উঠে গিয়ে সেখানেই থেমে গেল। যেন কেউ দুলতে গিয়ে পা দিয়ে আটকে রেখেছে সেটাকে। ব্র্যাট ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো সেই ফাঁকা দোলনার সামনে। একইভাবে সেটা আটকে আছে সামনের দিকে উঠে। ওর মনে হল নিজে একবার বসে দেখবে কিনা তাতে। কিন্তু ওকে চমকে দিয়ে হঠাৎ সেই অবস্থা থেকেই দোলনাটা দুলতে শুরু করল দুদিকে। কিছুক্ষণ দোলার পরে স্বাভাবিকভাবেই সেটা স্থিতাবস্থায় এসে থামল। ব্র্যাট গিয়ে বসল তাতে। বসার জায়গায় হাত দিয়ে ঘষল। হাত সরিয়ে নিয়ে আশেপাশে তাকাল একবার। গদির উষ্ণতা থেকে মনে হচ্ছে কেউ যেন একটু আগেই এখানে বসেছিল। এখানেই আগের রাতে দারুণ ঘুম হয়েছিল দুজনের। হালকা দখিনা বাতাসের স্পর্শে এখানে ঘুম আসতে বাধ্য। তবে আজকে ঘুমোনের কোটা পূর্ণ হয়ে গেছে ব্র্যাটের। রাতটা জেগেই কাটানো যাবে।

দোলনা থেকে উঠে এসে ডাইনিং রুমের সোফায় বসে টিভিটা চালিয়ে দিল এবার। কোনও ভালো ইংলিশ মুভি হলে দেখা যায় বসে। একটার পর একটা চ্যানেল ঘোরাতে থাকল ও। বত্রিশ নম্বর চ্যানেলে স্টার মুভিজে টার্মিনেটর হচ্ছে। এই সিনেমাটাকে মনে হয় চ্যানেলটা কিনে নিয়েছে। সেই ছোটবেলায় ব্র্যাট প্রথম দেখেছিল এটা স্টার মুভিজেই। আজও একইভাবে দেখিয়ে যায় ওরা মাঝেমাঝেই। তবে বারবার দেখলেও ভালোই লাগে বেশ। রিমোটটা সামনের টেবিলে রেখে সোফায় বেশ আয়েশ করে বসে ব্র্যাট মোবাইলের স্ক্রিন অন করতেই সুদেবের হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ঢুকল তাতে।

– ব্র্যাট, অল ওকে তো? কিছু দরকার হলেই কল করিস।

– সব বিন্দাস ভাই। তোর ফ্ল্যাটটা আমাকে দিয়ে দে সুদেব। মস্তির জায়গা। আমাদের মতো ব্যাচেলরদের আদর্শ জায়গা।

– ভুলেও বলিস না। তিস্তা এই অফার লুফে নিলে আমি দেউলিয়া হয়ে যাব এবার। বাই দ্য ওয়ে, তোর ভূতদর্শনের কী স্ট্যাটাস? কেউ এল তোর নজরে এবার?

– নাহ, মনে তো হচ্ছে না তেমন কিছু। তুই চাপ নিস না। রেস্ট নিয়ে নে। গুডনাইট।

ফোনটা বন্ধ করে মুখ তুলে টিভির দিকে তাকিয়ে ব্র্যাট একটু অবাক হল। এর মধ্যেই চ্যানেল চেঞ্জ হয়ে গেছে। নয় নম্বর চ্যানেলে ন্যাট জিও-তে এসে গেছে। রিমোটটা তুলে টিভি বন্ধ করে দিল ব্র্যাট। কিছু একটা সমস্যা রয়েছে এখানে বোঝা যাচ্ছে। সুদেবের কাছে এই ব্যাপারগুলো খুবই হাস্যকর। ব্র্যাট উঠে দাঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে গেল।

রাত বারোটা নাগাদ ডিনার সেরে শোওয়ার ঘরের লাগোয়া ছোট ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল ব্র্যাট। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। সুদেব ওর স্কচের সন্ধানও দিয়ে রেখেছে হোয়াটসঅ্যাপে, কিন্তু একা একা ড্রিন্স করতে ওর ভালো লাগে না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে থাকলে তবেই আসল মজা। তাছাড়া এখন নিয়মিত জিমে যাওয়ায় পানাসক্তির দিক থেকে অনেকটাই সেরে এসেছে। শরীরটাকে তো রাখতে হবে, ওটাই আসল। মাসলম্যান বলে অফিসে সুনাম আছে ব্র্যাটের, কিন্তু পেশীবহুল শরীরের থেকে সুস্থ শরীর যে অনেকাংশে ভালো, এটাই বোঝে না অনেকে। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে ব্র্যাট বাইরের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল। রাতের আকাশে আজ চাঁদ তারারও দেখা নেই, মেঘলা করে আছে সকাল থেকেই।

সিগারেটটা আঙুলে নিয়ে ব্র্যাট রেলিং-এর ওপর হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল। জায়গাটা সত্যিই বড় ফাঁকা ফাঁকা। শেয়ালের ডাক শোনা গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আঙুলের টুসকিতে ছাই ফেলতে গিয়ে নিচে তাকাতেই ওর চোখে পড়ল বিলালের ঘরে আলো জ্বলছে না। গেটের কাছেও ওর দেখা নেই। রাতে গার্ড দেওয়ার মতো তেমন কোনও ব্যবস্থাই নেই। ব্র্যাট মুখ তুলে আবার ধোঁয়া ছাড়ল একটা। সিগারেটের শেষ অংশটা রেলিং-এ ঘষে নিভিয়ে টুসকি মেরে নিচের দিকে ছুঁড়ে দিল। আর তখনই অবাক হয়ে গেল নিচের দিকে তাকিয়ে। ঠিক ওর নিচের ব্যালকনিতেই রেলিং-এ ভর দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে একজন মহিলা। ব্র্যাট আরও একটু ঝুঁকল। পরনে সবুজ শাড়িটা ওর চেনা চেনা লাগছে। কোথাও কি দেখেছে আগে! ব্র্যাটের অবাক লাগে যে এইসব মুহুর্তে অন্য কেউ থাকলে ভয়ে হার্টফেল করে যেত, কিন্তু ওর সেইরকম কোনও অনুভূতিই হয় না। বরং জানতে ইচ্ছে করে আরও ঘটনাটা। নয় তলার বন্ধ ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে এত রাতে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা। সে যেই হোক, একটু আলাপ তো করতেই হয়। ব্র্যাট মাথা ঝুঁকিয়ে একটু চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল, "শুনছেন, অতটাও ঝুঁকবেন না নিচের দিকে। মাথা ঘুরে যাবে।"

ভদ্রমহিলার এলোমেলো খোলা চুলে মুখের কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আচমকা রাতের বেলা একজন অপরিচিত লোকের এমন সম্ভাষণ শুনেও তিনি অবিচলিত রইলেন। ব্র্যাটের মনে হল মহিলা হয়তো শুনতে পাননি। আবার চেষ্টা করে বলল ওপর থেকে, "আপনাকেই বলছি ম্যাম, নয় তলার ফ্ল্যাটটা কি আপনার? আমি ব্রতীন্দ্র। সুদেবের বন্ধু।"

ব্র্যাট ভাবল ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো! মহিলা যেন একটু নড়লেন মনে হল। এর পরের ঘটনার জন্য ব্র্যাট প্রস্তুত ছিল না। ভদ্রমহিলা ওইভাবেই রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঘাড় তুলে ব্র্যাটের দিকে চাইলেন। চমকে রেলিং থেকে পিছনে সরে এল ব্র্যাট। এই মহিলাকেই আজ সকালে লিফটে দেখেছে ও। ভদ্রমহিলার চাউনি বেশ ভয়ঙ্কর। ওই চোখের দিকে বেশি ফোকাস তাকিয়ে থাকা যায় না। মনে হল যেন প্রচণ্ড রেগে আছেন উনি। সাহস করে ব্র্যাট আবার মুখ বাড়াল ব্যালকনি দিয়ে। নিচের ব্যালকনি ফাঁকা। হঠাৎ রোখ চেপে গেল ওর। চটপট বাইরে এসে নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। নয় তলার অন্ধকার ঘুটঘুটে করিডরে কোনোরকমে নিচের ফ্ল্যাটের সেই দরজার কাছে এসে চাপ দিল তাতে খোলা আছে কিনা দেখার জন্য। যথারীতি বন্ধ সেটা। নক করল দুবার। কোনও সাড়া এল না। বেশ জোরেই ধাক্কা দিল এবার দরজায়। মাঝরাতে একটা একা মহিলার ফ্ল্যাটে এসে এরকম অসভ্যতা করতে বেশ খারাপই লাগছে ব্র্যাটের। কিন্তু সেসবের পরোয়া নেই ওর। কোথাও একটা গুগোল আছে মনে হচ্ছে ওর। আরও বেশ কয়েকবার দরজা ধাক্কিয়েও কোনও লাভ হল না। সুদেব বলেছিল বিলালের কাছে চাবি আছে এই ফ্ল্যাটের। কিন্তু ওর কাছ থেকে এখন চাবি চাইতে গেলে দেবে না অচেনা একজনকে।

ব্র্যাট আবার উঠে এল ওপরে নিজের ফ্ল্যাটে। ভেতর থেকে দরজা লক করে এসে দাঁড়াল সেই ছোট ব্যালকনিতে। এখন ওর যেটা করতে ইচ্ছে করছে সেটা হয়তো একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাবে। কিন্তু সুদেব আর তিস্তার কথা ভেবে এই রিস্কটুকু নিতেই হবে। "যা থাকে ভাগ্যে, জয় বজরংবলী", বলে ব্র্যাট রেলিংয়ের বাইরের দিকে একটা পা রাখল। অন্য পাটাও সাবধানে নিয়ে এল বাইরে। হাত দিয়ে রেলিংটা শক্ত করে ধরে দুপাশে তাকালো কোনও ধরার জায়গা আছে কিনা দেখার জন্য। দেওয়ালে খোপ খোপ ইঁটের নকশা করা। সেই খাঁজে সন্তর্পণে ডানপা রেখে হাত দিয়ে ধরল আরেকটা ইঁটের খোপ। উল্টোদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার নিচেটা দেখে নিল। হাত ফসকালেই সোজা নিচে, তারপর সোজা ওপরে। মুখ ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে দেওয়াল আর পাইপের মতো একটা অংশ ধরে ধরে নিচের ব্যালকনির দিকে নামতে থাকল। একটু এগিয়ে বুঝতে পারল এখানে আর ধরার জায়গা নেই। ওপরের ইঁটের খোপে হাত দিয়ে ঝুলিয়ে দিল শরীরটা। পা ছুঁড়ে শরীরটাকে সামনে পিছনে দুবার দুলিয়ে ব্র্যাট লাফিয়ে পড়ল নয় তলায় অন্ধকার ব্যালকনিতে। হাত পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। বাঁদিকের হাঁটুটা ঘষে ছড়ে গেছে বেশ খানিকটা।

ঘরের ভেতরে নিকষ কালো অন্ধকার। মোবাইলের আলো ছাড়া উপায় নেই। ফ্ল্যাশলাইট অন করে মোবাইলটা বুকের কাছে ধরে ঘরে ঢুকল। একদম সুদেবের ফ্ল্যাটের মতোই ঘর, তাই বুঝতেও অসুবিধা হচ্ছে না। ঘর দিয়ে বড় ডাইনিং প্লেসের কাছে ব্র্যাট এসে দাঁড়াল। আলো আঁধারির এই পরিবেশে সুদেবকে আনলে এখানেই মূর্ছা যেত নির্ঘাত। অন্ধকারে চোখ এখনও সয়নি ওর। চারিদিকে আলো ফেলে দেখতে দেখতে একবার ডাক দিল, "ম্যাডাম, আপনি কি আছেন এখানে? কী করে থাকেন একা এই অন্ধকার ঘরে। ভয় করে না আপনার?" এগিয়ে গেল বড় বারান্দার দিকে। কিচেনও ফাঁকা, কেউ নেই। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। ওর মনে হচ্ছে একটু বেশিই পাগলামো হয়ে যাচ্ছে। ব্র্যাটের মনে পড়ল ছোটবেলায় বাবা বলত ভয়কে জয় করতে হলে ভয়ের উৎসের দিকে এগিয়ে যাও। আজ সেই কথাটা ফলছে অবশেষে। বারান্দাতেও মোবাইলের টর্চটা জ্বালিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। এই ভেবে স্ক্রিন অন করে টর্চটা নেভাতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল ব্র্যাটের। আবার জ্বালিয়ে দিল টর্চটা সঙ্গে সঙ্গে। বারান্দার কাঁচের দরজার ঠিক ওপাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই ভদ্রমহিলা। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন ব্র্যাটের দিকে। কিন্তু টর্চ জ্বাললেই আর দেখা যাচ্ছে না। ব্র্যাট বুঝল ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। ভয়ের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে হয়তো ও। তবে এখানে থমকে গেলে চলবে না। ভয়ের উৎসের দিকে আবার এগোতে হবে। মোবাইলের টর্চটা জ্বলে রেখেই বারান্দার দরজাটা পেরিয়ে ও ভেতরে ঢুকল। দরজা থেকে একটু সরে এসে মোবাইলটা মুখের সামনে ধরে টর্চটা অফ করল আবার। ভদ্রমহিলা আর নেই দরজায়। টর্চ না জ্বলেই সাহস করে ধীরে ধীরে পিছনে ফিরল। গোটা ডাইনিং রুম সামনে। চোখ এখন নাইটভিশনের কাজ করছে অনেকটাই। স্পষ্ট না হলেও বাইরে থেকে আসা হালকা আলোয় বোঝা যাচ্ছে ঘরের ভেতরটা। সোজা হেঁটে গেলে বেরোবার দরজা। ব্র্যাটের আর ব্যালকনি বেয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। দরজা খুলেই বেরোতে হবে। কিন্তু মহিলা এইভাবে লুকোচুরি খেললে কী করে কুশল বিনিময় হবে। এই ভেবে এগিয়ে গেল আবার সামনের দিকে। ঘরের দিকে তাকালো। সেখানে বা ছোট ব্যালকনিতেও কেউ নেই। ব্র্যাট ডাইনিং রুমের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে আশেপাশে ভালো করে তাকাল। মোবাইলের টর্চটা আবার জ্বালিয়ে চারিদিকে ফিরে একবার সিলিং-এর দিকে ফেলল। ভদ্রমহিলা আর যেই হোন, ওর কিন্তু কোনও ক্ষতি করছে না। সিলিং-এর দিকে রেখেই টর্চের আলোটা বন্ধ করে ফোনটা নামাতে গিয়েই ব্র্যাট এক ঝলকে দেখে ফেলল সেই মহিলার বর্তমান অবস্থান। ওর ঠিক মাথার ওপরে সিলিং ফ্যানের রডটা জাপটে ধরে বসে আছে সেই মহিলা। তাকিয়ে আছে ওর দিকেই। আর মুখ তুলতে মন চাইল না ব্র্যাটের। এই দৃশ্যটা সত্যিই বেশ চাপের। মন শক্ত করে এবার এগিয়ে গেল দরজার দিকে। মানে মানে কেটে পড়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ মনে হচ্ছে। দরজার লকটা ওপরে কোণের দিকে। হাত দিয়ে টেনে খুলে ফেলল সেটা। ব্র্যাটের আর ইচ্ছে করছে না যাওয়ার আগে একবার পিছু ফিরে মহিলাকে দেখে যেতে। শেষ দৃশ্যটা ওর সাহসকে অনেকটাই চ্যালেঞ্জ দিতে পেরেছে।

লকটা খুলে ব্র্যাট দরজার হ্যান্ডেলটা ধরে টানল। বেশ শক্ত হয়ে গেছে মনে হয়। জোরে টান দিল, তাতেও খুলল না। আর কোনও লক আছে কিনা দেখল। নাহ, একটাই ওপরে। হ্যান্ডেল ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দু তিনবার চেষ্টা করল। কিন্তু দরজা আটকানো। ব্র্যাটের খুব একটা সুবিধের ঠেকছে না এবার। সুদেবকে একটা মেসেজ করে রাখবে কিনা ভাবছে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পিছনে তাকাতেই মনে হল ওর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে সেই....

দুটো শক্তিশালী হাত ব্র্যাটের ঘাড় আর মাথা চেপে ধরে দরজার সঙ্গে ঠেসে দিল। প্রচণ্ড শক্তি সেই হাতে। ব্র্যাট ওর মধ্যেই নিজের হাত মুঠো করে পিঠের দিকে ছুঁতে লাগল, ডানপা পিছনে ছুঁড়েও সেটা কারুর শরীরেই লাগল না। ঘাড় কোনোমতেই ঘোরানো যাচ্ছে না। অসহ্য ব্যথা করছে এবার মাথায়। আর না পেরে চিৎকার করে উঠল ব্র্যাট, "হেএএল্ল, বাঁচাও...".। ঘরের বাইরে মনে হয় না সেই আওয়াজ গেল। হঠাৎ এক ঝটকা টানে মেঝেতে পড়ে গেল ও। চিত হয়ে কিছু বোঝার আগেই দেখতে পেল সেই মহিলা মাথা নিচু করে ওর পা দুটো ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের দিকে। মহিলার মুখের ওপর খোলা চুল এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে। একটা চাপা গোঙানির শব্দ আসছে সেই চুল দিয়ে ঘেরা অন্ধকার ভেদ করে। হুৎপিও এবার সত্যিই লাফাতে শুরু করেছে ব্র্যাটের। কিছু বোঝার আগেই ওকে টানতে টানতে ছোট ব্যালকনিতে নিয়ে এল সেই অসীম শক্তিদারী মহিলা। এবার ব্র্যাটের বুকের কলারটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওকে দাঁড় করিয়ে পিছন থেকে ঠেলে দিল রেলিং-এর দিকে। আসন্ন বিপদের আঁচ পেতে শুরু করে দিয়েছে ব্র্যাট। মনে হচ্ছে আর নিস্তার নেই এই বাঁধন থেকে। পিছন থেকে ঘাড়টা ধরে রেখেছে সেই শক্তিশালী হাত দুটো। ব্র্যাট ওর হাত দিয়ে কোনোরকমে রেলিংটা জাপটে আছে। কোমর থেকে ওর পুরো শরীরটাই এখন সামনের দিকে ভাঁজ হয়ে বাইরে ঝুলছে। মাথা তোলার উপায় নেই কোনও। পা দুটো মাটিতে ঘষে ব্র্যাট চেষ্টা করছে ভারসাম্য বজায় রাখার। ঘাড়ে চাপ বাড়ছে। এই অশরীরী শক্তির হাত থেকে বাঁচতে নিচে পড়ে যাওয়া কি ভালো! বুঝতে না পেরে প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগল ব্র্যাট। দারোয়ানের নামটাও মনে আসছে না এখন এই পরিস্থিতিতে। আর নেওয়া যাচ্ছে না এই ভার। ব্র্যাটের হাত আর পা অবশ হয়ে আসছে। রেলিংটার মুঠো ছাড়তে হবে এবার। অসহায়ের মতো নিজের সিঁদুলকে নিজেই ধিক্কার জানাতে ইচ্ছে করছে ওর। এইভাবে জীবন শেষ হওয়াকে মেনে নেওয়া যায় না। পায়ের পাতা অসাড় হয়ে গেছে। ঘষে রেলিং থেকে সরে যাচ্ছে। সময় আসন্ন। আর পারল না ব্র্যাট।

হাত আর পা আলাগা করে দিয়ে চোখ বন্ধ করে নিল। কিন্তু এক ঝটকায় ওর শরীরটাকে টেনে আবার বারান্দায় এনে ফেলল সেই হাতদুটোই। অবিশ্বাস্য দৃষ্টি নিয়ে ব্র্যাট দেখল ওর আশেপাশে কেউ নেই। ব্র্যাটের শরীরেও আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। কোনোরকমে মাটিতে পড়ে রইল রেলিং ঘেঁষে। অসহ্য জল তেঁপা পাচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে ওর। পরিবেশ আবার শান্ত। হঠাৎ বাইরে দরজা খোলার আওয়াজ কানে এল। কিছু চিন্তা করারও শক্তি নেই যেন আর। কিছুক্ষণ বাদেই বারান্দায় এসে হস্তদন্ত হয়ে ঢুকল বিলাল। ব্র্যাটকে দেখেই চমকে উঠে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত দিয়ে টেনে তুলে বসাল।

– আপ হিয়া ক্যায়সে আয়ে? উঠিয়ে! চোট ক্যায়সে লাগা? আপকা আওয়াজ সুনাই দিয়া নিচে সে তো হাম দউড়কে আয়ে।

ব্র্যাট কোনও জবাব না দিয়ে বিলালকে ধরেই উঠে দাঁড়াল কোনোরকমে। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমাকে একটু ওপরের ক্ল্যাটে নিয়ে যাবে ভাই?"

খুব দূর থেকে সুদেব আর তিস্তা ওর নাম ধরে ডাকছে মনে হল।

– ব্র্যাট, অ্যাই ব্র্যাট! হাতে পায়ে চোট কী করে লাগল তোর। ওঠ না! কী হয়েছে তোর। সুদেব, তোমাকে বারণ করেছিলাম কাল ওকে একা রেখে যেও না।

চোখ খুলে ব্র্যাট দেখল ওর বিছানার দুদিকে সুদেব আর তিস্তা বসে ওর দিকেই ঝুঁকে তাকিয়ে আছে। চোখ কচলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল,

– তোরা এসে গেছিস? কখন এলি!

– এফুগি এলাম। বিলালের থেকে চাৰি নিয়ে। কী হয়েছে বলবি খুলে। বিলাল কীসব হাবিজাবি বলছিল।

বিছানায় উঠে বসে ব্র্যাট বলল, "সব ঠিক আছে। কিছু হয়নি। আমি বিন্দাস আছি। তোদের নেমন্তন্ন কেমন হল বল?"

তিস্তা ধমকের সুরে বলল, "এত ক্যাজুয়াল হোস না প্লিজ ব্র্যাট। আমাদের বল কী হয়েছে তোর সঙ্গে?"

– চিন্তা করিস না তিস্তা। আমাকে আর দুটো দিন থাকতে দিবি মা তোর আশ্রয়ে?

"সবসময় ইয়ার্কি! একটা লিমিট আছে ব্র্যাট," এই বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তিস্তা। সুদেবের দিকে তাকিয়ে ব্র্যাট বলল, "তোর কোনও কাজ আছে এখন?"

– নাহ্, ছুটি তো!

– আমার সঙ্গে একটু বেরোতে পারবি? কোথায় যাচ্ছি সে ব্যাপারে তিস্তাকে কিছু বলিস না।

– ওক্কে!

আজমতলায় বাড়ি খুঁজতে অসুবিধা হল না দুজনের। সুদেব আগে দুবার এসেছে এখানে বুকিং এর কথাবার্তার সময়। তিনতলা বাড়ি বেশ শৌখিনভাবেই বানানো। বেল টিপতেই একটা মাঝবয়সী ছেলে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই?"

সুদেবই উত্তর দিল।

– রাকেশবাবু আছেন?

– হ্যাঁ, কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আছে আপনার?

– না। ওনাকে বলুন খুব জরুরি একটা দরকারে সুদেব চক্রবর্তী দেখা করতে এসেছে। উনি চিনবেন।

ছেলেটা ভেতরে ঢুকে এক মিনিটের মধ্যেই এসে বলল, "আসুন ভেতরে। অপেক্ষা করুন এই ঘরে, স্যার আসছেন একটু বাদেই। ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছেন।"

ছেলেটা পাখা চালিয়ে দিয়ে চলে যেতেই সুদেব পাশ থেকে নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুই শিওর ব্র্যাট? ভুল হচ্ছে না তো কোথাও?"

– পাক্কা খবর। বিলাল ছেলেটা ভুল বলবে না।

– হুম, আমি ওখানে এতদিন থেকেও জানতে পারলাম না!

এই সময়ে রাকেশবাবু ঘরে ঢুকলেন। হাতের কোনও আঙুলই আর ফাঁকা নেই। সবরকম পাথরই সংগ্রহে আছে মনে হল। বয়স চল্লিশের একটু বেশিই হবে।



সফল প্রমোটার সুলভ আচরণ আছে হাঁটাচলার মধ্যে। বসেই আগে সুদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন,

– কী সুদেববাবু? নিজের ক্ল্যাটে জায়গা কম পড়ছে নাকি?

সুদেব হঠাৎ ঘাবড়ে গেল প্রথমেই এমন প্রশ্ন শুনে। আমতা আমতা করে উত্তর দিল, "কেন বলুন তো? ঠিক বুঝলাম না।"

– সবাই বুঝে যাচ্ছে, আর আপনিই বুঝলেন না! অন্যের ক্ল্যাটে যাওয়ার এত দরকার কেন পড়ছে আপনার? সব খবরই আমি পাই।

সুদেব চোখ বড় বড় করে তাকাল। ব্র্যাট মাঝখান থেকে বলে উঠল, "আপনার কাজ কিন্তু খাসা রাকেশবাবু, যাই বলুন। কোনও দুশ্বরী নেই। দেখেই বোঝা যায়।"

– আপনাকে তো ঠিক...

– ব্রতীন্দ্র। আমি সুদেবের বন্ধু। আজকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার দরকারটা আসলে আমারই।

– অ। কী দরকার? ক্ল্যাট কিনবেন? বাজেট কত?

– হ্যা, কিনতে চাই না। বেচতে চাই?

– মানে? তো এখানে কেন এসেছেন? সুদেববাবু আপনাকে এখানে আসতে বলেছে?

– হুমম, সুদেবই বলল আপনি লোকটা বড় ভালো। সৎভাবে কাজ করেন। তাই আপনার হয়ত ভালো লাগবে অফারটা শুনে।

– কথা শেষ হয়েছে আপনার? তাড়াতাড়ি বলে উঠে যান। আমার সময়ের দাম আছে।

– সে তো অবশ্যই। আসলে আমার পৈত্রিক জমি আছে পাঁচ কাঠা মতন। সেটাই বেচার জন্য লোক খুঁজছিলাম। বিদেশে চলে যেতে হবে আমাকে। দেখাশুনা করার লোক নেই। তাই যত তাড়াতাড়ি হোক, যেমন দামে হোক.. যাকগে, উঠি আজ, নমস্কার।

– বসুন।

– না না থাক, আপনার সময়ের দাম বাড়ছে..

– আরে বসুন বললাম তো। ঠান্ডা নেবেন, নাকি চা কফি? অ্যাই রাজু এদিকে আয় তো...

সুদেব অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখল। কথা বলায় ব্র্যাট ওস্তাদ।

– না না আজ কিছু নেব না। আপনি রাজি থাকলে সুদেবের ক্ল্যাটে একদিন চলে আসুন না। কথা হবে সেখানেই।

– ওখানে কেন? ওদিকে আমি আর যাই না তেমন। এখানেই তো আসতে পারেন। বা আপনার বাড়িতেও যেতে পারি। সুদেববাবু এর মাঝে এসে কী করবেন?

– স্কচ চলে আপনার?

রাকেশবাবুর চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বোকার মতো হেসেও ফেললেন দাঁত বার করে। ব্র্যাট ওঁর জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল,

– সুদেবের স্কচের কালেকশন দেখেননি বলেই বলছেন।

– আচ্ছা। জমির লোকেশন কোথায় ব্রতীন্দ্রবাবু?

– প্রাইম লোকেশন। আলাদা লেভেলের দাম পেতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য। আপনি সুদেবের চেনাজানা, তাই আর চিন্তা নেই। সব কথাবার্তা হয়ে যাবে। আমি নিজে গিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দেব। বৌদির নামেই কিনবেন তো?

– বৌদি? এখানে বৌদি কীভাবে আসছে?

– প্রোপ্রাইটার কি আপনি নাকি? এই বাজারে নিজের নামে ব্যবসা চালাচ্ছেন? গুরুদেব লোক মশাই আপনি রাকেশবাবু।

ব্র্যাট উঠে রাকেশবাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিল এই মওকায়।

– আঙে না। আমার স্ত্রী গত হয়েছেন এক বছর হতে চলল। আগে ওঁর নামেই ছিল। এখন আমার নামে।

ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে উল্টোদিকের দেওয়ালের দিকে দেখালেন। সুদেব ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে আবার সামনে তাকাল। ওর দেখাদেখি ব্র্যাটও পিছন ফিরে দেওয়ালে টাঙানো ছবির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্থব্ব হয়ে গেল।

তারপর সামনে ফিরে বলল,

– আমি দুঃখিত রাকেশবাবু।

– না না ঠিক আছে।

– বৌদি কীভাবে..... না মানে আপনি যদি কিছু মনে না করেন..

– আপনি বলে দেবেন কবে আসতে হবে। আমি পৌঁছে যাব। লোকেশন আর কাগজপত্র ঠিক থাকলে অ্যাডভান্স নিয়েও চিন্তা করবেন না। আরেকজন ক্লায়েন্ট এসে অপেক্ষা করছে। আমি উঠলাম। আবার দেখা হবে ব্রতীন্দ্রবাবু।

ভদ্রলোক নিজের ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর আবার একবার পিছনে ছবির দিকে ঘুরে তাকাল ব্র্যাট। কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। এমন কিছু যে দেখতে হতে পারে তা ধারণাই ছিল না ওর। বিলাল কাল রাতেই বলেছিল যে নয় নম্বর ফ্ল্যাট রাকেশবাবুর নিজের। বিক্রি হবে না ওটা। আর আজকে এখানে এসে...

মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে ব্র্যাটের। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বাইকে স্টার্ট দিয়ে সুদেবকে ডাকল।

– জলদি আয়। তোকে বাড়িতে ড্রপ করে আমার একটা কাজ আছে।

সুদেব পিছনে উঠে বসতেই ছুটে চলল বাইক।

– কী করতে চাইছিস বল তো ব্র্যাট? আমি তো কিছুই বুঝছি না। ওই ফ্ল্যাট যদি রাকেশবাবুর হয়, তার সঙ্গে আমাদের ঘটনাগুলোর কী সম্পর্ক? আমার এবার সব ভুলভাল লাগছে। মনে হচ্ছে না আমরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি এই বিষয়ে? যেসব জিনিস মন থেকে মানি না, তাতে তোকে আমি কতটা সাহায্য করতে পারব জানি না।

– সুদেব, দুনিয়াটা বড়ই জটিল রে। একে একে দুই সবসময় হয় না। একটা কথা বল। মানুষ সহজে কার কাছে মাথা নত করে, লোভ না ভয়?

– যদি নিস্তার পাওয়ার সুযোগ না থাকে, তাহলে তো মনে হয় ভয়।

– তবে তাই হোক।

সুদেবের কমপ্লেক্সের ভেতরে এসে বাইক থামাল ব্র্যাট।

– তুই চলে যা ওপরে। আমি দু এক ঘন্টা পরে আসছি। কয়েকটা কাজ মিটিয়ে।

সুদেব মাথা নেড়ে চলে যাওয়ার পর ব্র্যাট এগিয়ে গেল বিলালের ঘরের দিকে। দুপুরের খাওয়ার তোড়জোড় করছিল সে। ব্র্যাটকে দেখেই উঠে এল।

– আইয়ে সাব। তবীয়ত ঠিক হয়? উস ফ্ল্যাট মে অউর মাত জাইয়েগা। মালিক হামকো ডাঁটেঙ্গে।

– তুমি মালিককে খবর দিয়েছ?

– হামি কী করব সাব!

– বিয়ে করেছ?

– হাঁ করেছি। দেশে বিবি অউর বাচ্চা আছে।

– বাইক চড়তে ইচ্ছে করে?

– করে তো। লেকিন... আপকা ইয়ে বাইক একদম ঝক্কাস আছে। সলমন ভাইজানের জ্যায়সা।

– তাই? চলো, তোমাকে ঘুরিয়ে আনি। একটা দবং রাইড হয়ে যাক?

– আভি?

– হাঁ আভি, আ যাও।

ব্র্যাট বাইকে উঠে স্টার্ট দিয়ে বিলালকে ডাকতেই সে ঘর বন্ধ করে এসে উঠে বসল তাতে। পিছনের হ্যান্ডেল শক্ত করে ধরে নিল বসেই।

– এখানে ফাঁকা রাস্তা কোথায় আছে বিলাল?

– জি, খোড়া আগে মে এক্সপ্রেসওয়ে হয়।

– বাহ।

ব্র্যাট বাইক চালিয়ে বড় রাস্তার দিকেই চলল। রোদের তাপ আজ ভালোই। ছুটির দিন দুপুরের দিকে রাস্তায় গাড়ি চলাচল একটু কম। এক্সপ্রেসওয়ে আসতেই তার বড় লেনে বাইকটা তুলে অ্যাক্সিলেটরে মোচড় দিল।

– বিলাল ভাই, তুমি ভাবীকে চিনতে?

বিলাল কোনও জবাব দিল না দেখে আবার জিজ্ঞেস করতে উত্তর দিল সে।

– জি, না। আমি কাউকে চিনতে না। থোড়া ধীরে চালান সাব। লরি আউর ট্রাক বহত হয় ইধার। হেলমেট ভি নেহি হয় হামারা।

– ভয় লাগছে নাকি বিলালবাবু?

– জি থোড়া লাগছে সাব। জান প্যায়ারা হয়।

ব্র্যাট ধীরে ধীরে গতি বাড়াতে থাকল। কাঁটা এখন নব্বই কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। লরিগুলোকে পাশ কাটিয়ে একধার দিয়েই চালাচ্ছে ও।

– বিলাল সাব, নয় তলার ক্ল্যাটে কী হয়েছিল যখন কেউ হ্যান্ডওভার পায়নি?

– হামকো নেহি মালুম সাব। আপ ওয়াপাস চলিয়ে। ডর লাগ রাহা হয়।

ব্র্যাট গতি আরও বাড়াতে থাকল। কাঁটা এখন একশো পাঁচ ছুঁই ছুঁই। সামনের দুটো লরি সামনাসামনি যাচ্ছে। ব্র্যাট প্রথমটাকে চেপে মাঝখান দিয়ে অন্যদিকে বেরিয়ে আবার লেন পরিবর্তন করে আগের লেনে ফিরে এল। বিলাল এখন পিছনের হ্যান্ডেল ছেড়ে থিমচে ধরেছে ব্র্যাটকেই। ব্র্যাট জিজ্ঞেস করল,

– যতক্ষণ আমি উত্তর পাব না, ততক্ষণ এই বাইকের গতি বাড়াতেই থাকবে। তৈরি তো?

– না সাব না। অ্যায়সা করবেন না। আল্লাহ কে নাম পে হামে ছোড় দিজিয়ে...

– তাহলে বলো ভাবীজির নাম কী? বাড়ি কোথায়?

– কমপ্লেক্স সে থোরা দূর মে হি। হাম পাতা দে দেঙ্গে আপকো। উনকা নাম থা নিলীমা।

এবার ব্র্যাটেরই ব্যালেন্স টলে যাচ্ছিল। সামনের গাড়িটাও ব্রেক কষছে বুঝতে পারেনি। কোনোরকমে কাটিয়ে বেরলো বাঁদিক দিয়ে। আরেকটু হলেই বিপদ হত। একই স্পীডে ধরে রেখে ও এবার জিজ্ঞেস করল।

– কীভাবে মারা গেছিলেন উনি?

– সুসাইড সুসাইড। আপ প্লিজ রুক যাইয়ে। তকলিফ হো রাহা হয় হামকো।

– কোথায় সুসাইড করেছিলেন উনি?

– নেহি পাতা। অউর কুছ নেহি পাতা! হাত জোড়তা হুঁ ম্যায়।

– আমি জানি তুমি সব জানো। এটা বলে দাও শুধু কোথায় সুসাইড হয়েছিল। নয়তো আরও স্পীড বাড়াব আমি।

ব্র্যাট সামনের তিনটে গাড়িকে জিগজ্যাগ ভাবে ওভারটেক করল ওই গতিতেই। এত রাফ ভাবে বাইক এর আগে ও কোনোদিন চালায়নি। অ্যাক্সিডেন্টের সময়ও না। কিন্তু আজ এই পক্ষীরাজ আজব খেল দেখাচ্ছে।

– কী হল বিলাল? কোথায় হয়েছিল সুসাইড?

– ন তল্লা কে ক্ল্যাট সে কুদকে..

– হ্যালো ব্র্যাট, কখন ফিরবি তুই। লাঞ্চ সাজিয়ে বসে আছি আমরা।

– তোরা খেয়ে নে সুদেব। আমার আরেকটু দেরি হবে।

– তুই বাড়ি ফের তো আগে। তখন থেকে ঘুরছিস কোথায় কোথায়?

– না রে, আরেকটু সময় দে।

– কী যে করছিস কে জানে। আর হ্যাঁ, শোন, আরেকটা ব্যাপার হয়েছে আমরা যখন রাকেশবাবুর বাড়ি গেছিলাম।

– কী হয়েছে? তিস্তা ওকে তো?

– তিস্তার হাতে এখন ন'খানা দাগ। আজ রান্নাঘরে কাজ করতে গিয়ে ওর মনে হয়েছে কেউ ওর হাত চেপে ধরেছিল। এসব কী হচ্ছে ব্র্যাট? আমি কি তিস্তার ডাক্তার বদলাব?

– সুদেব, খুব মন দিয়ে শোন। তুই তিস্তাকে আর একদম একা ছাড়িস না যতক্ষণ না আমি বলব। আর ওর সামনে এই ডাক্তার বদলানোর কথা একদম বলিস না প্লিজ। ওকে বলিস আজকের দাগটাই শেষ দাগ। আর আঁচড় পড়বে না, পড়ার কথাও নয়। ও যেন আর চিন্তা না করে।

ফোন রেখে বাইকে চাবি দিয়ে লক করে ব্র্যাট এগোলো দোতলা বাড়িটার দিকে। বিলাল এই ঠিকানাই দিয়েছিল। ওকে ওর বাড়িতে নামিয়ে ব্র্যাট প্রথমেই গিয়েছিল লোকাল পুলিশ স্টেশনে। যা জানার বা বোঝার ছিল, সেটা হয়ে গেছে। পুলিশ প্রথমে কোনও উত্তরই দিতে চায়নি। ওকে বের করে দিচ্ছিল থানা থেকে। পরে একটু চপ দিতে ওরা সম্মান করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসায়। তবে পুলিশের ডায়েরিতেও একই বয়ান লেখা আছে। নিলীমা সুইসাইড করেছিল ন'তলার ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে। আগামীকাল সেই ঘটনার এক বছর পূর্ণ হবে। ব্র্যাটের মন বলছে সুইসাইডের এই তথ্য ঠিক নয়। পুলিশও ওকে আর বেশি ঘাঁটায়নি।

দোতলা বাড়িটা বেশ পুরনো দিনের। বিলালের কথা মতো বাড়িওয়ালা থাকে ওপরে। নিচের তলা ভাড়া দেওয়া। একতলার দরজার বাইরে একটা অস্থায়ী নেমপ্লেটে লেখা তিনজনের নাম। হরিসাধন মুখার্জি, গৌরী মুখার্জি, নিলীমা মুখার্জি। দরজায় নক করল ব্র্যাট। একটা পুরনো পন্থা ব্যবহার করতে হবে আজকে আলাপের জন্য। ধরা পড়ে গেলে পালানো ছাড়া পথ নেই।

একজন ষাটোর্ধ্ব ভদ্রলোক দরজা খুলে বাইরে এলেন। চশমার ফাঁক দিয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন। ব্র্যাট কিছু বলার আগেই উনি হঠাৎ বললেন,

– দীপক নাকি রে? কবে ফিরলি তুই?

ব্র্যাটের মনে হল নিজস্ব পন্থার থেকে এই সুযোগটাকেই কাজে লাগালে হয়, যা থাকে কপালে।

– হ্যাঁ মেসোমশাই, এই সপ্তাহেই। আপনি কেমন আছেন?

– দেখো কাণ্ড! আয় আয় ভেতরে আয়। কই শুনছ, তাড়াতাড়ি এসে দেখে যাও কে এসেছে। পাঁচ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে এসে এখন ভুলেই গেছে যে আমাকে কাকু বলে ডাকত।

ব্র্যাট একটা টোঁক গিলল। ছড়িয়ে ফেলেছে প্রথমেই। আরেকটু সামলে কথা বলতে হবে। ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক ব্র্যাটকে বসতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেতরের ঘর থেকে একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে ব্র্যাটকে দেখেই অবাক হয়ে গেলেন। বললেন,

– দীপক, তোর চেহারা তো অনেক বদলে গেছে রে বিদেশের হওয়া লেগে। নিলীমা আগে ছবি দেখাত তোর, কিন্তু আর তো সেই সুযোগ নেই।

ব্র্যাটের মনে হল নিলীমার মৃত্যু সংবাদ না জানার ভান করা যাবে না। এক বছর অনেকটা সময়। তাই একটু ভেবে নিয়ে বলল,

– আমি এখনও মেনে নিতেই পারছি না কাকিমা। কীভাবে যে সব হঠাৎ হয়ে গেল। খুব ইচ্ছে ছিল আসার। কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পেলাম না।

হরিসাধনবাবু সামনের চেয়ারে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। নিলীমার মা এসে বসলেন ব্র্যাটের পাশে। ওর হাত ধরে ছলছল চোখে জিজ্ঞেস করলেন,

– বাবু, তুই কিছুই শুনিসনি না?

– না কাকিমা তেমন তো কিছু জানতেই পারিনি।

হরিসাধনবাবু বাধা দিলেন কথার মাঝে।

– গৌরী, ওকে এসবের মধ্যে টেনো না। আমাদের জীবনটা যেভাবে চলছে চলুক। কিন্তু ওকে ছেড়ে দাও। জানোই তো খবর পৌঁছে যাবে। তখন ওকেও রেহাই দেবে না।

ব্র্যাট বেশ আশ্চর্য হয়ে তাকাল হরিসাধনবাবুর দিকে।

– কাকু, আপনি নিশ্চিন্তে আমাকে বলতে পারেন সবকিছু। আমি আপনাদের কাছের লোক। তাছাড়া আমি এই দেশের বাসিন্দাও নই, তাই কেউ কিছু করতে পারবে না আমার। আপনি সব খুলে বলুন। আমার জানা দরকার।

হরিসাধনবাবু একবার চাইলেন ওঁর স্ত্রীর দিকে। তারপর ব্র্যাটের দিকে ঘুরে বললেন, "শোন তাহলে।"

তিস্তা কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল আরেকবার। মনের ভুল হচ্ছে না তো! খুব চেনা এই গলাটা। কিন্তু কোথায় শুনেছে কিছুতেই মনে পড়ছে না। আবার কানে বাজল ডাকটা, "তিস্তা, অ্যাই তিস্তা, আয় না।"

তিস্তা উঠে দাঁড়াল সোফা থেকে। ব্র্যাটের ফিরতে দেরি হবে বলে সুদেব লাঞ্চ সেরে নিয়ে এক ঘুম দিতে চলে গেছে ঘরে। তিস্তা কানে হেডফোন লাগিয়ে একটু গান শুনছিল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল বাইরে থেকে কেউ ডাকছে ওর নাম ধরে। হেডফোন খুলে উঠে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু আর শোনা গেল না। আবার সোফায় বসার সময় একটা মেয়ে যেন ওকে ডাকল, "তিস্তা!"

প্রথমে মনে হয়েছিল বারান্দা থেকে আসছে শব্দটা। কিন্তু বারান্দায় গিয়ে ঘুরে দেখে এল তিস্তা। ঘরে আসতেই মনে হল দরজার বাইরে থেকে আসছে শব্দটা।

"আয় না তিস্তা আমার সঙ্গে"।

তিস্তার মনে হল ওর খুব যেতে ইচ্ছে করছে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যেতে। যেন খুব কাছের কেউ আহ্বান দিচ্ছে ওকে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখল কেউ নেই। দুপুরবেলা করিডর পুরো ফাঁকা। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে করিডরে আসতেই মনে হল সিঁড়ির লবির দিক থেকে একটা মেয়ের কান্নার আওয়াজ আসছে। তিস্তার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল। দেখল ও তেমন ভয় পাচ্ছে না, কিন্তু ওর অনুভূতিগুলো যেন কেউ হঠাৎ ভোঁতা করে দিয়েছে কোনও যাদুবলে।

তিস্তা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। নয় তলার করিডরে এসে দাঁড়াতেই দেখল ওদের ফ্ল্যাটের ঠিক নিচের ফ্ল্যাটের দরজাটা আধখোলা। তার ভেতর থেকেই আবার সেই মেয়েটার ডাক ভেসে এল। "আয় না তিস্তা, এদিকেই তো। আরেকটুখানি, চলে আয় তিস্তা, আয়...."।

তিস্তা মোহাম্বল হয়ে এগিয়ে গেল সেই দরজার দিকে।

– দীপক, তুই চা বা কফি কিছু নিবি বাবা? দেখ জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি।

– কিছু লাগবে না কাকিমা। আগে শুনি কাকুর থেকে সবটা।

হরিসাধনবাবু বলতে শুরু করলেন।

– আমাদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত ছয় কাঠা জমির ওপর আমি কিছুটা জায়গা নিয়ে বাড়ি তৈরি করি ১৯৭৮ সালে। তবে বাবা বলেছিলেন যে ওই জমি খুব পবিত্র। পূর্বপুরুষরা কোনও এক কালীভক্ত ডাকাত সর্দারের কাছ থেকে দেখাশোনা করার জন্য পেয়েছিলেন সেই জমি। তবে সেই কালীভক্ত আর ফিরে আসেননি। জমিও তাই মুখার্জি বংশের কাছেই রয়ে যায়। বাপ ঠাকুরদার বিধান অনুযায়ী ওই জমিতে বংশের যে কেউ গৃহ নির্মাণ করতে পারবে। কিন্তু জমি বা বাড়ি কোনোদিন কাউকে বেচা যাবে না। তাহলেই অমঙ্গল নেমে আসবে পরিবারের ওপর।

– এই বাড়ি আপনাদের কোথায় ছিল?

– ধুর বোকা তুই সবই ভুলে গেছিস নাকি দীপক? যে বাড়িতে তুই নিলীমার সঙ্গে খেলতে আসতিস ছোট থেকেই।

ব্র্যাট এবার সতর্ক হয়ে বলল, "আচ্ছা ওকে ওকে। না আমি ভাবলাম ওর আগেও কোনও বাড়ি ছিল আপনাদের।"

– না রে বাবা, ওটাই। নিলীমার স্কুল একটু দূরে ছিল, যেতে সময়ও লাগত, তবে সেটা সয়ে গেছিল। কিন্তু অদৃষ্টের হাতে অন্যকিছুই লেখা ছিল। তুই বিদেশ যাওয়ার পরের বছর নিলীমার ওপর নজর পড়ল একজন বছর সাঁইত্রিশ আটত্রিশের এক যুবকের। নাম রাকেশ সামন্ত। প্রমোটারদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল তার। কিন্তু শখ ছিল নিজে প্রমোটারির লাইনে আসার। অথচ ট্যাঁকে টান থাকায় তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। আমার বোকা মেয়েটা ওই লোকটার সঙ্গেই জড়িয়ে পড়ল। দিনরাত কোথায় কোথায় ঘুরত। গৌরীর একদমই পছন্দ ছিল না ছেলেটাকে। কিন্তু আমি বাবা হয়ে বিশেষ বাধা দিতে চাইনি নিলীমার ব্যক্তি স্বাধীনতায়। অবশেষে বিয়ের কথা উঠতেই এক অদ্ভুত দাবী করে বসল পাত্রপক্ষ। দাবীটা যে রাকেশেরই মস্তিষ্কপ্রসূত সেটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হল না।

– আপনাদের জমিটা চাইল?

– আবার কী! রাকেশের বাবা মা পাকা কথা বলতে এসে জানাল যে ওদের কোনোরকম দাবিদাওয়া নেই। শুধু জামাইয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা যেন ওই বাড়ি আর জমি ওদের দিয়ে দিই যাতে রাকেশ বাড়ি ভেঙে সেই জমিতে নিজের প্রথম প্রোজেক্ট বানাতে পারে। এতে নাকি আমার মেয়েই সুখে থাকবে।

– আপনি কি মেনে নিলেন?

– না রে দীপক। আমি কিছু বলার আগে নিলীমাই বেঁকে বসল হঠাৎ। হবু স্বশুর শাশুড়ির মুখের ওপর বলে দিল যে ওই দাবী ওর পক্ষেও মেনে নেওয়া সম্ভব নয় একদমই। রাকেশ ওকে নাকি কোনোদিন এই ব্যাপারে কিছুই বলেনি আগে।

গৌরী দেবী পাশ থেকে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "তুই বল দীপক, পূর্বপুরুষের বিধান দেওয়া জমি, ওইভাবে তুলে দেওয়া যায় মেয়ের কথা ভেবে? অমঙ্গল হলে তো...."

ব্র্যাট নিজের হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিল বৃদ্ধাকে। তারপর হরিসাধনবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নিলীমার প্রতিবাদে কোনও কাজ হয়েছিল?"

– না। রাকেশ প্রথমে ওকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল। একের পর এক উপহার আসতে লাগল বাড়িতে যাতে নিলীমার মন গলে। কিন্তু এতেও যখন কাজ হল না, তখন শুরু হল ভয় দেখানো। নিলীমা কিন্তু একদমই ভয় পাওয়ার মেয়ে ছিল না। তবে আমাদের কথা ভেবেই একটু সতর্ক হয়ে গেছিল। ও শর্ত দিয়েছিল যে আগে বিয়ে সম্পন্ন হবে। রাকেশ যদি আমাদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়, তবেই ও ভেবে দেখতে পারে। এতে রাকেশের তরফ থেকেও হঠাৎ ভয় প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেল।

– কীভাবে ভয় দেখাত রাকেশবাবু?

– নানাভাবে। ওর চেলা চামুগুরা রাস্তায় দেখলেই টোন টিটকিরি কাটত। জমি নিয়ে জিজ্ঞেস করত। রাকেশ এসে বলত পার্টি অফিস থেকে জমির দখল নিতে পারে। দলিল দেখতে চাইত।

– পুলিশকে জানাননি কেন আপনারা?

– জানাতে গেছিলাম একদিন। বুঝলাম লোকাল পুলিশ আর নেতাদের অলরেডি হাত করে নিয়েছে রাকেশ। তারা পাতাই দিল না। বেশ আটঘাট বেঁধেই এই লাইনে আসতে চাইছিল রাকেশ। কিন্তু নিলীমার দেওয়া শর্তের পর দেখলাম ওদের বাড়ির সবাই আমাদের সঙ্গে বেশ ভালোই ব্যবহার করতে শুরু করল। এতে আমাদেরও মন নরম হল। মনে হল পণ তো চাইছে না আলাদা করে। তাই আর বাধা দেওয়ার থেকে মেনে নেওয়াই ভালো। আমার মেয়েটাই তো পাবে সম্পত্তি। অমঙ্গলের কথা মাথা থেকে মুছে গেল। খুব ঘটা করে না হলেও নিলীমার বিয়েটা ভালোভাবেই হল বুঝলি।

– বিয়েতেও আসতে পারিনি ওর। খুব খারাপ লাগছিল কাকু।

– জানি রে, নিলীমা বলেছিল যে তুই চেষ্টা করেছিস অনেক, কিন্তু ম্যানেজ করতে পারিসনি। ছোটবেলার বন্ধুদের মধ্যে এক তুই ছিলিস যে আসতে পারিনি। আরেকজন ছিল ওর স্কুলের বেস্ট ফ্রেন্ড। পরে যোগাযোগ বেশি ছিল না। তুই হয়তো চিনতেও পারিস।

– কে বলুন তো কাকু?

তিস্তা আধখোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই আওয়াজ করে দরজাটা ওর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালো ও। কিন্তু কারুর দেখা পেল না। সারা ফ্ল্যাট জুড়েই কেমন এক থমথমে নিস্তব্ধতা। দুপুরবেলার চড়া রোদ এসে ডাইনিং রুম বেশ আলোকিত হয়ে আছে। তিস্তা বুঝতে পারছে না ও কেন এখানে চলে এল একটা অজানা ডাক শুনে। ভয়ও লাগছে না আর। মনে হচ্ছে যেন চেনা কারুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ঠিক এই মুহূর্তে ওর খুব কাছ থেকে এল আওয়াজটা।

– তিস্তা, খেলবি আবার? আগামীকাল আমার শেষ খেলা। তুই আসবি রে? একসঙ্গে খেলবি। খুব মজা হবে।

চমকে এদিক ওদিক তাকাল তিস্তা। এই গলা ওর চেনা, খুব চেনা। অনেকদিন পরে শুনছে। কিন্তু ওর মনে পড়ে গেছে ছোটবেলায় যাকে সমস্ত গোপন কথা আরামসে বলে দিতে পারত, সেই বন্ধুর গলা। স্কুলের গণ্ডি পেরোবার পরেও অনেকদিন যোগাযোগ ছিল, কিন্তু সংসারের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে বন্ধুত্বের টান আলাদা হয়ে যায়। তিস্তা হন্যে হয়ে ছুটে গেল বারান্দার দিকে। সেখান থেকে আবার ভেতরে এসে ছুটে ঘরে ঢুকল, সেখান থেকে দৌড়ে লাগোয়া বারান্দায়। কোথাও কেউ নেই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে তিস্তা একটু গলার স্বর বাড়িয়েই বলল, "কোথায় লুকিয়ে আছিস নিলীমা? সামনে আয় না। কতদিন তোকে দেখিনি!"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল যেন ঘরের চারিদিক থেকেই।

– তুই আমায় চিনতে পেরেছিস তিস্তা?

– পেরেছি রে! কোথায় ছিলিস এতদিন? আমারই দোষ রে যোগাযোগ করতে পারিনি তোর সঙ্গে।

– আমারও দোষ। কিন্তু এই দেখ তোর সঙ্গে আবার যোগাযোগ তো আমিই করলাম তিস্তা। তুই থাকবি আমার সঙ্গে? আমি খুব একা রে এখন।

তিস্তা মোহাম্বল গলায় জবাব দিল, "থাকব তো! তুই আর আমি আবার কত গল্প করব, খুনসুটি করব।"

– ঠিক তো তিস্তা? তোকে আমি একটা গল্প বলব। তোকে না বললে যে..

তিস্তার মনে হল ঠিক ওর পিছনেই কেউ গুটি গুটি পায়ে এসে দাঁড়াল। পিছন থেকে কাঁধে হাত রাখতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে চমকে গেল তিস্তা।

– সুদেব, তুমি?

– এখানে কী করছ তুমি? কেন এসেছ এই ক্ল্যাটে আবার? রাকেশবাবু কিন্তু সব জানতে পেরেছেন যে আমরা এই ক্ল্যাটে আসি বারবার। এফুগি চলা ওপরে।

সুদেবের চোখে মুখে এমন রাগ আগে দেখেনি তিস্তা। উত্তরের অপেক্ষা না করেই সুদেব ওর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে ওকে ক্ল্যাটের বাইরে নিয়ে গেল। তিস্তা পিছন ঘুরে তাকিয়ে দেখল দূরে বারান্দার কাছে কেউ যেন দাঁড়িয়ে। কিন্তু সুদেব আর দেখার সুযোগ না দিয়ে দরজাটা সজোরে বন্ধ করে তিস্তাকে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

– তিস্তা, আমি বারণ করে দিলাম তুমি একা একা কোথাও যাবে না এখন। ব্র্যাটও বারবার করে বলে দিয়েছে।

– আমি নিজে থেকে আসিনি সুদেব, নিলীমা আমাকে...

– কী? আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এবার তিস্তা। তুমি পাগল হয়ে গেছ। চামড়ার ডাক্তার দেখাবার আগেই তোমাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখালে ভালো হত। অনেকদিন ধরে সহ্য করছি এইসব। আর নেওয়া যাচ্ছে না।

– তুমি রেগে যাচ্ছ কেন এইভাবে? ব্র্যাট ফিরেছে?

– না এখনও আসেনি সে। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ভগবান জানে। নিজেও ফাঁসবে, আমাদেরও ফাঁসাবে। ওকে এসব না বললেই ভালো ছিল দেখছি। তোমার সাধাসাধিতে ওকে বাড়িতে ডাকার ব্যাপারে রাজি না হলেই ঠিক হত। যতসব বুজরুকি কেস!

তিস্তা নিজের ক্ল্যাটে এসে বসল সোফায়। ওর মন পড়ে রইল নিচের ক্ল্যাটের দিকেই।

– সুদেব জানো তো, নীচের ক্ল্যাটে নিলীমা...

– স্টপ ইট তিস্তা! জাস্ট স্টপ ইট! আবার নতুন গল্প শুরু করছ এখন? কে নিলীমা? বন্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে এবারে তুমি। সবকিছুর একটা লিমিট থাকে। ব্র্যাট আসলেই ওকে বলছি সব।

সুদেব ঘরে ঢুকে যেতেই তিস্তার মনে পড়ল আগামীকাল কিছু একটা খেলা শেষ করার কথা বলছিল নিলীমা।

হরিসাধনবাবু দরজা বন্ধ করতেই বাইকে স্টার্ট দিল ব্র্যাট। সেই সকাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি। জমিয়ে থিদে পেয়েছে। মনে হচ্ছে রাস্তাতেই কিছু কিনে খেয়ে নিলে ভালো হয়। ব্র্যাট ভাবল সুদেবদের ক্ল্যাট তো বেশি দূর নয়, ওখানে গিয়েই কিছু খাওয়া যাবে।

বিকেলের হাওয়া এসে চুলে লাগছে। বাইক চালাতে চালাতেই ব্র্যাট মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাচ্ছে। মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে এখন। হরিসাধনবাবুর কথায় স্পষ্ট যে নিলীমার মতো মেয়ে কোনোদিন সুইসাইড করতে পারে না। নিজের সুবিধা ভোগ করার জন্য ওকে যদি রাকেশ ফাঁসিয়েই থাকে, সেটা তো নিলীমা একরকম মেনে নিয়েই বিয়েতে রাজি হয়েছিল। কাজ হাসিল হয়ে যাওয়ার পর নিলীমাকে আর পাত্তাই দিত না রাকেশবাবু। নিলীমার মায়ের এই অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে সুইসাইডের দিকেই পাল্লা ভারি। কিন্তু এইসব ঘটনা ঘটছে কেন ক্ল্যাটে! কোথাও একটা গোলমাল তো আছেই।

বাইক গ্যারেজে রেখে ব্র্যাট লিফটে করে এসে পৌঁছলো সুদেবের ক্ল্যাটে। দরজা খুলে ওকে দেখেই তিস্তা বলল, "কোথায় ছিলিস তুই? আগে কিছু খেয়ে নে, তারপর কথা বলিস।"

ব্র্যাট হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে এসে বসল। সুদেব আর তিস্তা ওর মুখের দিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে। চামচ দিয়ে এগ টোস্টের একটা অংশ কেটে মুখে পুরে ব্র্যাট বলল,

– তিস্তা, তোর হাতটা দেখা তো।

তিস্তা কবজি ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলল, "আমার মনে হয় ব্র্যাট এটা কোনও একটা ইঙ্গিত। এই নটা দাগের মানে নয় তলার ক্ল্যাট কি?"

– আমারও তাই মনে হয়েছে আজকে।

– জানিস তো তুই আসার আগে একটা ঘটনা হয়েছে। আমার ছোটবেলার বেস্ট ফ্রেন্ড..

– নিলীমা?

– তুই কী করে জানলি?

ব্র্যাট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করল দুপুরে নিলীমার বাড়িতে গিয়ে যা যা জানতে পেরেছে, সবটা। ওর বলা শেষ হতেই সুদেব বলে উঠল,

– ব্র্যাট, দেখ আমার কাছে এইসব ঘটনার কারণ খোঁজা খুবই হাস্যকর। তবে তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে এই রাকেশবাবু লোকটা সুবিধের নয়। কোথায় কী কর্ম করে রেখেছে ভগবান জানে। তাই এত ঝামেলায় না জড়িয়ে পুলিশকে সব বলে দিলেই তো হয়। ওরাই তদন্ত করে সত্যিটা খুঁজে বের করুক।

– বোকার মতো কথা বলছিস সুদেব। পুলিশ প্রমাণ চাইবে। ওরা কি আমাদের কথায় বিশ্বাস করবে?

– শোন ব্র্যাট, গুছিয়ে ডাঙা পড়লে সব উগড়ে দেবে ওই রাকেশ সামন্ত। জেরার মুখে আচ্ছা আচ্ছা অপরাধীরাও সব দোষ স্বীকার করে নেয়। লোকটা নিজের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সবার মুখ বন্ধ রেখেছে শালা। এখন বুঝতে পারছি কেন ফ্ল্যাটের কাজ ছমাস বন্ধ ছিল। চ কালকেই আমরা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে সব খুলে বলি।

– সুদেব, তুই এতটা নিশ্চিত হচ্ছিস কীভাবে?

– তোর কথা শুনেই তো। আমার আর সহ্য হচ্ছে না এইসব নাটক।

ব্র্যাট একটু কপালে হাত দিয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর সুদেবকে বলল, "আচ্ছা, তোর কাছে জমির এগ্রিমেন্ট পেপার আছে?"

– হ্যাঁ, থাকার কথা, খুঁজতে হবে। ও নিয়ে কী করবি?

– একটা জিনিস জানতে হবে। আর আগামীকাল রাকেশবাবু স্ত্রীয়ে মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হবে।

তিস্তা চমকে বলে উঠল, "কী বলছিস রে? আজকেই তো নিলীমা..."

সুদেব টেবিল ছেড়ে উঠে বলল, "তোদের ছেলেমানুষি চালিয়ে যা, আমি উঠলাম।"

– ... আমি গতকাল বাড়ি থেকে জমির কাগজপত্র নিয়ে এসেছি। আজ সন্কেবেলা আপনি চলে আসুন সুদেবের ফ্ল্যাটে। নেমন্তন্ন রইল। আরেকটা প্রমিসও যা ছিল, সেটাও হবে।

– আজকে কোনোভাবেই হবে না ব্রতীন্দ্রবাবু, অন্য কোনোদিন করুন।

– আমার তাড়া আছে বুঝছেন না রাকেশবাবু। পরশু ফ্লাইট। চলে আসুন আজই, কথাও হবে, পার্টিও হবে।

– হুমম, কী আর বলব! দেখছি...

ব্র্যাট ফোনটা রাখতেই সুদেব ব্রেকফাস্ট শেষ করে ওকে বলল, "একটা অসৎ লোককে বাড়িতে ডাকছিস। আমার কিন্তু এই ব্যাপারটা ভালো লাগছে না একদমই ব্র্যাট। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয়। তুই হয়তো ভুলে যাচ্ছিস এটা আমার ফ্ল্যাট আর তুই এখানে..."

তিস্তা মাঝপথে থামিয়ে বলল, "কীসব বলছ তুমি? ও তো আমাদের ভালোর জন্যই করছে এইসব! ওর পক্ষেও কতটা রিস্কি সেটা বুঝতে পারছ না?"

– বুঝতে চাইও না। তোমরা দুজনেই বাচ্চাদের মতো আচরণ করছ। এখন কারুর কোনও বিপদ হলে কিন্তু আমরাও ফাঁসব মিলিয়ে নিও।

ব্র্যাট এবার শান্তভাবে বলল, "সুদেব, জানি যে আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি। কিন্তু বিশ্বাস কর আমায়, তোরা এই ফ্ল্যাটে নিরাপদ নয়। হয়তো আমি বুঝিয়ে বললে তোর গাঁজাখুরি মনে হবে। কিন্তু এখানে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। যতদিন তার সমাধান না হচ্ছে, তিস্তাই কষ্ট পাবে। আমি যেদিন একা ছিলাম, সেদিনই বুঝেছি যে এখানে থাকলে তোদের বিপদ আরও বাড়বে। এখন কি তুই ফ্ল্যাট চেঞ্জ করতে পারবি?"

– সম্ভব নয় সেটা। আর ভয় পেয়ে নতুন ফ্ল্যাটে মুভ করার কথা আমি জীবনেও ভাবতে পারব না। যাকগে, তোর ওপর আস্থা আছে। কিন্তু যা করবি সাবধানে করিস। আমি একটু আসছি বাইরে থেকে। তোদের জন্য কিছু আনতে হবে?

– সন্কেবেলা কিছু স্ন্যাকস লাগবে, নিয়ে আসিস। আর জমির কাগজটা পেয়েছিলিস?

– ওহো, ভুলেই গেছি। আমি ফিরে এসেই দেখছি।

সুদেব বেরিয়ে যেতেই তিস্তা বলল ব্র্যাটকে, "কিছু মনে করিস না প্লিজ ওর কথায়। বুঝতে পারছি ওর অবস্থাটা। অসহায় হয়ে এমন আচরণ করছে হয়তো।"

– ধুস, বন্ধুদের কথায় আবার কেউ কিছু মনে করে নাকি! তুই ওসব নিয়ে ভাবিস না। একটা কথা বল। তুই কি নিলীমাকে দেখেছিস এখানে কোনোদিন?



- না তো, খালি ওর আওয়াজ শুনেছি। আমিও জানিস তো ভয় পাইনি গতকাল ওই সময়, কেমন একটা কাতরভাবে ডাকছিল ও। ওই ক্ল্যাটের চার দেওয়ালের মধ্যেই যেন নিলীমা আটকে আছে এক বছর ধরে।
- জানি, আর এখন এটাও বুঝতে পারছি রাকেশ কীভাবে ওকে মেরেছে বা মারতে চেয়েছে?
- তুই জানতে পেরেছিস কীভাবে?
- থাক সে কথা এখন। ভয় পেয়ে যাবি তুই। যাকগে, মোবাইল ফুল চার্জ করে নিয়েছিস তো যেমন বললাম?
- একদম!
- ওকে, যেমন বলেছি সেইরকম করে যাবি। ঘাবড়াবি না একদম। কিছু বিপদ বুঝলেই আমি তোদের সাবধান করে দেব।

বিকেল থেকেই আকাশ বেশ গুমোট হয়েছিল আজকে। সন্কেবেলা রাকেশবাবু বাইক এনে কমপ্লেক্সের ভিতর ঢুকতেই তুমুল বেগে বৃষ্টি নামল। তাড়াতাড়ি চাবি দিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে উনি বাইরে থেকে বাটন প্রেস করলেন। বিলালের ঘরও বন্ধ। নির্ঘাত কোথাও আড্ডা মারতে গেছে। লিফট এসে থামতেই ভেতরে ঢুকে রাকেশবাবু নয় নম্বর বোতামে চাপ দিলেন।

লিফট ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল। নয় তলায় এসে থেমে লিফটের দরজা ফাঁক হতেই কোথা থেকে একটা দমকা ঠান্ডা বাতাস এসে ঢুকল ভেতরে। একটু চমকে গেলেন রাকেশবাবু। অন্ধকার করিডরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বুঝলেন ভুল ফ্লোরে চলে এসেছেন পুরনো অভ্যেসবশত। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে দশ নম্বর বোতামে চাপ দিলেন। আশ্চর্য, লিফটের দরজা কেন বন্ধ হচ্ছে না! উনি বারবার প্রেস করলেন দশ নম্বর বোতাম, লিফটের দরজা বন্ধ করারও একটা বোতাম আছে, সেটাও চেপে ধরে রইলেন। কিন্তু দরজা আর বন্ধ হল না। অনিচ্ছাসহেও বেরোলেন লিফটের বাইরে। অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা দুষ্কর। উপায় না পেয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন পিছনে লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে সেটি ওপরে উঠে গেল।

তিস্তাই দরজা খুলল। সুদেব আর ব্র্যাটও উঠে এসে রাকেশবাবুকে নিয়ে গিয়ে বসাল সোফায়। পায়ের ওপর পা তুলে বসে উনি বললেন,

- চমৎকার সাজিয়েছেন বৌদি ক্ল্যাটটা। ছিমছাম, শৌখিন।
- ধন্যবাদ। আপনি কফি নেবেন তো? তাহলে সবার জন্যই করতাম।
- কফি?

রাকেশবাবু চাইলেন ব্র্যাটের দিকে। বললেন,

- বাইরে বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। জমপেশ ওয়েদার। আবার কফি টফি কেন? কী বলেন ব্রতীন্দ্রবাবু?

ইশারা বুঝতে অসুবিধা হল না ব্র্যাটের।

- সে তো হবেই দাদা। এখন এক কাপ করে কফি হয়ে যাক না। রাত তো বাকি এখনও।
- হা হা, তা যা বলেছেন। সুদেববাবু, খবর কী? আপনাকে এখনও কলকাতার বাইরে যেতে হয়?
- না, এখন আর হয় না।
- যাক। তা ওই জমি আপনিও দেখেছেন তো?

সুদেব ঢোঁক গিলে বলল, "না, মানে ওটা আমার দেখা নেই।"

- ওকে। কেউই দেখেননি জমি? প্ল্যানের কাগজ কীসব এনেছেন বললেন ব্রতীন্দ্রবাবু। বার করুন দেখি।

ব্র্যাট একটু রাগী গলাতেই জবাব দিল,

- আপনি কি ব্যবসা ছাড়া কিছুই বোঝেন না রাকেশবাবু? আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না আজকে! আপনার এত তাড়া কীসের? এই তো এলেন। আরাম করে থাওয়াদাওয়া করুন, পান করুন। কথা তো হবেই।
- হা হা, আরে আপনি তো রেগে যাচ্ছেন। তাড়া তো আপনার ছিল। তবে তাই হোক।

তিস্তা কফির কাপগুলো এনে টেবিলে রাখল। রাকেশবাবুর দৃষ্টি ঘরের চারিদিকে ঘুরতে ব্যস্ত। সবকিছুই যেন চোখ দিয়ে মাপছেন উনি। ভদ্রলোকের চালচলনে একটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। ব্যবসায় সাফল্যের মাপকাঠি দিয়ে হয়তো একে মাপা কঠিন। ওঁর চোখের আড়ালে কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে, সেটা দেখলেই আন্দাজ করা যায়।

কফির পর্ব শেষ হওয়ার পর তিস্তার হাতে তৈরি লুচি আর মাংস দিয়ে নৈশভোজও বেশ ভালো জমল। রাকেশবাবু হাত ধুয়ে এসে সোফায় বসতেই ব্র্যাট সুদেবের ঘরের তাক থেকে স্কচ হইস্কির বোতল এনে হাতের মোচড়ে প্যাঁচ খুলে ফেলল। তিনটে গ্লাস নিয়ে তাতে হইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিল সবার দিকে। রাকেশবাবু প্রথম চুমুক মেরেই বললেন,

– কোথা থেকে আমদানি মশাই এটার? খানদানি মাল মনে হচ্ছে। আহা, মন ভরে গেল।

ব্র্যাট তাকাল সুদেবের দিকে আড়চোখে। সুদেব নিজের গ্লাস তুলে চিয়াঁস করে মুখে দিল। রাকেশবাবু বেশি কথার মানুষ নন। কিন্তু সুরায় বেশ ভালোই মনোনিবেশ করেছেন বোঝা যাচ্ছে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় রাউন্ড শেষ করে আবার গ্লাস বাড়িয়ে ব্র্যাটকে বললেন ভরে দিতে। ব্র্যাট গ্লাসে আবার হইস্কি ঢেলে ঝুঁকে দিয়ে বললেন,

– এত বড় কমপ্লেক্সের মালিক আপনি। নিজের জন্য একটা ফ্ল্যাট রাখলেন না কেন?

রাকেশবাবু প্রাণ ভরে একটা চুমুক দিয়ে হালকা আমেজের ঘোরে বললেন,

– রেখেছিলাম। কিন্তু...

– কিন্তু কী?

– থাকা হয়ে ওঠেনি।

– বৌদিও থাকেননি?

রাকেশবাবু অল্প নেশার ঘোরেই হঠাৎ চমক ভেঙে সোজা হয়ে বসলেন। চার নম্বর পেগ শেষ করে আবার গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

– জমির কাগজটা কখন দেখাবেন? চপ দেননি তো?

– ছি ছি, অতটাও নিচু মনের মানুষ নই আমি। জমি নিয়ে মিথ্যে বলব না। অন্তত আপনাকে না। তা এই কমপ্লেক্সের জমিটা তো আপনি দারুণ পেয়েছিলেন। কার থেকে কিনলেন?

– মানে? কার থেকে কিনব?

– না মানে সুদেবের এগ্রিমেন্ট পেপারে দেখলাম জমি হস্তান্তরের কোনও স্টেটমেন্ট নেই। আগের মালিকের নাম তো থাকে সব চুক্তিপত্রেই। আপনার পেপারে সেটা নেই কেন?

– আজব প্রশ্ন করলেন। আমারই জমিতে আমি প্রোজেক্ট করেছি, আর... আর আমাকে কিনা অন্যের থেকে কিনতে হবে!... এ কী কথা! রাকেশবাবুর কথা জড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। ব্র্যাট ইশারা করল তিস্তার দিকে। তিস্তা ওর মোবাইলটা হাতে নিয়ে চুপিসারে ভয়েস রেকর্ডার অন করে দিল।

ব্র্যাট আবার জিঞ্জোস করল,

– এই এত বড় জমি আপনার ছিল? এটা তো মেনে নিতে পারলাম না দাদা।

– তো কার ছিল? আপনার বাবার?

– আমার বাবার না হোক, নিলীমা মুখার্জির বাবার তো বটেই।

রাকেশবাবু চোখ বড় বড় করে তাকালেন ব্র্যাটের দিকে।

– এইসব কথা আপনাকে কে বলেছে?

– যেই বলে থাকুক, আপনি শুধু বলুন আমি ঠিক বলছি কিনা?

– এই জমি আমার। আমার স্বশুরমশাই স্বেচ্ছায় দান করেছেন আমাকে।

– স্বেচ্ছায়? আপনি নেশার ঘোরে ভুল বলছেন না তো? বা মিথ্যেও বলতে পারেন।

রাকেশবাবু গ্লাসটা হাতে ধরেই কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন সোফার পাশের দেওয়াল ধরে। ঘরের মধ্যেই কোনোরকমে টলতে টলতে পায়চারি করলেন একটু। তারপর সজোরে গ্লাসের পানীয়টা ছুঁড়ে মারলেন ব্র্যাটের দিকে।

আচমকা এই ঘটনার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। ব্র্যাট হাত দিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

– কাজটা কিন্তু ঠিক করলেন না আপনি!

– বেশ করেছি। বদনাম দেবেন আমার নামে? দিন। দেখি কত ক্ষমতা আপনার?

– চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন?

– হ্যাঁ দিচ্ছি। বলুন আর কী জানেন। আমিও শুনি।

– বলব। তবে আপনার সাহস আছে তো সত্যিটা শোনার?

– এত ভ্যান্ডারা না মেরে বলুন তো। শালা রাকেশ সামন্তর এলাকায় এসে তাকেই খেঁট দিচ্ছে! সাহস তো কম নয়!

ব্র্যাট হাত থেকে গ্লাসটা টেবিলে রেখে রাকেশবাবুর কাঁধে হাত রেখে বলল, "আসুন তবে আমার সঙ্গে। আপনাকে একজনের সঙ্গে আলাপ করাব।"

– কে? কার সঙ্গে?

– আরে আসুন না।

ব্র্যাট রীতিমতো জোর করেই রাকেশবাবুকে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো। ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে ওকে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সিঁড়ির দিকে।

রাকেশবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

– কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমায়? লিফটে চলুন। আমার মাথা টলছে। সিঁড়ি দিয়ে অত নামতে পারব না।

– আরে আলবাত পারবেন। বেশি নামতে হবে না। মাত্র একটা তলা। আসুন তো।

ব্র্যাট ওকে ধরে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। তিস্তাও ওদের অনুসরণ করে বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। সুদেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আসবে না?"

– আমি আর গিয়ে কী করব?

– আরে এসেই না দরজাটা ভেজিয়ে রেখে।

নয় তলার করিডরে এসে সেই ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে ব্র্যাট জিজ্ঞেস করল রাকেশবাবুকে,

– চিনতে পারেন এই ফ্ল্যাটটা?

রাকেশবাবু অন্ধকারের মধ্যেই কোনোরকমে তাকালেন ফ্ল্যাটের দরজার দিকে। মাতাল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর নিজেই দরজা ধরে অল্প চাপ দিলেন। দরজা ফাঁক হতেই ভেতর থেকে ভেসে এল বাইরের ঝড় বৃষ্টির শব্দ।

ওঁকে অনুসরণ করে ব্র্যাট তিস্তা আর সুদেবও ঢুকল ভেতরে। অন্ধকার ঘরে বাইরের জানলা দিয়ে আসা ক্ষীণ আলোয় কিছুই দেখা যাচ্ছে না তেমন। তার ওপর একটানা ঝড় বৃষ্টিতে চাঁদও ঢেকে গেছে। ব্র্যাট পকেট থেকে ওর ফোনটা বের করে হাতে রাখল, কিন্তু ফোনের টর্চ জ্বালাল না। রাকেশবাবু ঘরে ঢুকে সোজা এগিয়ে গেলেন ডাইনিং স্পেসের মাঝ বরাবর। কিছুদূর এগিয়ে থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ ওইভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন বড় বারান্দার দিকে তাকিয়ে। ব্র্যাট পিছন থেকে বলে উঠল,

– দেখতে পেলেন রাকেশবাবু? বৌদি কিন্তু এখানেই থাকেন। আপনাকে খুব মিসও করেন।

রাকেশবাবু পিছনে ফিরলেন। দেখে মনে হল বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উনি ঠিক ওয়াকিবহাল নন। নেশার ঘোরেই বললেন,

– এ.. এখানে কেন আনলেন আমাকে?

তিস্তা উত্তর দিল এবার।

– কারণটা তো আপনি বলবেন রাকেশবাবু। আগের বছর এই দিনে এই ফ্ল্যাটে ঠিক কী হয়েছিল নিলীমার সঙ্গে?

রাকেশবাবু কোনও জবাব না দিয়ে মেঝেতেই বসে পড়লেন। মাথা নিচু করে রইলেন কিছুক্ষণ। পিছনের দরজা দিয়ে ছিটকে আসা বিদ্যুত চমকানির আলোয় ব্র্যাট দেখল রাকেশবাবুর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলার ছায়া।

– নিলীমা!

ব্র্যাটের মুখ দিয়ে ওর অজান্তেই বেরিয়ে গেল নামটা। বিকট শব্দ করে একটা বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও। চমকে উঠল ঘরের সবাই। রাকেশবাবু কানে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। তিস্তা সরে এসে সুদেবের হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়াল। ব্র্যাট গিয়ে হাঁটু মুড়ে ওর সামনে বসে জিজ্ঞেস করল,

– কিছু মনে পড়ছে রাকেশবাবু? নাকি মনে করিয়ে দিতে হবে?

রাকেশবাবু অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন, "নিলীমা... আমার নিলীমা... আমাকে ছেড়ে চলে গেল জানেন?"

– আপনি কোথায় ছিলেন সেদিন? এই ফ্ল্যাটেই তো?

– আমি? আমার কিছু মনে পড়ছে না। আমাকে ফিরিয়ে চলুন আ.. আপনাদের ঘরে প্লিজ। আমার ভা.. লো লাগছে না আর এখানে থাকতে।

সুদেব অনেকক্ষণ নির্বাক শ্রোতা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর এবার চোঁচিয়ে বলে উঠল, "নাটক করছে শালা। বলুন কী হয়েছিল সেদিন এখানে? আপনি স্ত্রীর সঙ্গে কী করেছিলেন?"

সুদেবের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে ঘটনাটা ঘটল, তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। ঘর আর বারান্দার সমস্ত দরজা জানলা প্রচণ্ড শব্দ করে হঠাৎ খুলে গেল। এমনকি ডাইনিং স্পেসে আর রান্নাঘরে থাকা কাপবোর্ড আর শোকেসের পাল্লাগুলোও সশব্দে আছড়ে পড়ল।

রাকেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ছুটে লাগলেন। কিন্তু ব্র্যাট ওকে জাপটে ধরে ফেলতেই উনি হাত মুঠো করে ছুঁড়লেন ব্র্যাটের মুখের দিকে। মুহূর্তে মুখ সরিয়ে নিলেও রাকেশবাবুর আরেকটা হাতের মুঠো এসে পড়ল ওর পেটে। কঁকিয়ে মাটিতে বসে পড়ল ব্র্যাট। উনি আবার এগিয়ে যেতে লাগলেন দরজার দিকে। কিন্তু এবার ওঁর রাস্তা রুখে দাঁড়াল তিস্তা।

– কোথায় পালাচ্ছেন আপনি রাকেশবাবু? আজ এই ঘরেই আপনাকে বলতে হবে কী হয়েছিল সেদিন। নিলীমা সুইসাইড করেছিল? নাকি আপনি...

তিস্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই রাকেশবাবু দরজার দিকে না গিয়ে সোজা ছুটে ঢুকলেন ঘরের ভেতর। সেখান থেকে ছোট ব্যালকনিতে গিয়ে মাথা বার করে চোঁচাতে লাগলেন বিলালের নাম ধরে। তিস্তা ঘরে ঢুকে ব্যালকনির দিকে যেতেই দেখল ব্যালকনির দরজাটা ওর সামনে সজোরে বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকেই। তিস্তা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানেই। আকস্মিক তলপেটে আঘাত থেকে নিজেকে কিছুটা সামলে উঠে এসে ব্র্যাট দাঁড়াল তিস্তার পাশে। কাঁচের দরজা দিয়ে দেখল ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে থাকা রাকেশবাবুর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে নিলীমা। পরনে সেই সবুজ শাড়ি, তাকিয়ে রয়েছে রাকেশবাবুর দিকে। ব্র্যাট তিস্তাকে বলল, "রাকেশবাবুর বিপদ, আমাদের বাঁচাতে হবে ওকে যেভাবেই হোক। ওঁর কিছু হয়ে গেলে আমরা সবাই ফাঁসব। তুই এখানেই দাঁড়া, আমি দরজাটা খোলার চেষ্টা করি।"

ব্র্যাট ছুটে গিয়ে দরজাটা ধরে টানার চেষ্টা করল বেশ কয়েকবার। তারপর পা দিয়ে লাথি মারতে লাগল যাতে কাঁচটা ভেঙে ফেলা যায়। কিন্তু তাতেও কিছুও হল না। ঝুঁকে নিচু হয়ে দরজার ফাঁকা জায়গায় আঙুল ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে টানতে লাগল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। দরজার সামনে উঠে দাঁড়াতেই চমকে দুপা পিছিয়ে এল ব্র্যাট। দরজার ঠিক ওপাশেই দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নিলীমা। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ভিতরের দিকে। যেন ওর ইশারাতেই খুলে গেল দরজাটা। ধীরে ধীরে ভিতরে আসতে থাকল ও। ব্র্যাট দ্রুতগতিতে তিস্তার হাত ধরে টেনে ওকে নিয়ে ঘরের বাইরে ডাইনিং স্পেসের মাঝখানে চলে এল। তিস্তা ভয় পেয়ে ওকে জিপ্তেস করল,

– কী হল ব্র্যাট। এখানে চলে এলি কেন? রাকেশবাবুর কী বিপদ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার খুব ভয় লাগছে!

ব্র্যাট দেখল ঘরের দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বাইরে বেরলো নিলীমা। ব্র্যাট আর তিস্তার দিকে তাকিয়ে একটা করুণ অথচ ভয় ধরিয়ে দেওয়া স্বরে বলল, "তিস্তা, তুই ভয় পেলি?"

আচমকা এই কথা শুনে তিস্তা জড়িয়ে ধরল ব্র্যাটের হাত। চোঁচিয়ে বলল, "ব্র্যাট! নিলীমার গলা শুনতে পাচ্ছি আমি! ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।"

সুদেব দাঁড়িয়েছিল ফ্ল্যাটে ঢোকান দরজা ঘেঁষে। ঘরের এই পরিবেশে অচেনা এক গলা শুনে সুদেবও ভয় পেয়ে সোঁটিয়ে গেল দরজায়। কোনোরকমে দরজার ছিটকিনি খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

ব্র্যাট দেখতে পাচ্ছে নিলীমার মুখ। এলোমেলো চুল মুখের ওপর এসে পড়ছে। হাওয়ায় তা সরে গেলেই ওর ফুঙ্ক আর অতৃপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। মুক্তির আশায় যেন ও আটকে আছে এই ঘরে গোটা একটা বছর। আজ কোন বিপদ অপেক্ষা করে আছে সেটা ওই ভালো জানে। প্রতিশোধের আঘাত যেকোনও মুহূর্তে নেমে আসবে রাকেশবাবুর ওপর। ব্র্যাটের মনে হল যেভাবেই হোক রাকেশবাবুকে দিয়ে দোষ স্বীকার করাতে হবে। তাতে যদি নিলীমা শান্তি পায়। কিন্তু ব্র্যাটকে চমকে দিয়ে আবার নিলীমা ওর অস্বাভাবিক গলায় বলে উঠল,

– তিস্তা! আজ তোকে বলেছিলাম না আমার শেষ খেলা...

তিস্তা কানে হাত চেপে ধরল। আর শোনার মতো সাহস নেই ওর। কিন্তু সারা ঘর কাঁপিয়ে সেই অদৃশ্য আওয়াজ এসে প্রবেশ করছে ওর কানে। নিজের বন্ধুর গলার আওয়াজ এত ভয়াবহ লাগেনি ওর কোনোদিন। তিস্তা যেন পারছে না আর নিজেকে ঠিক রাখতে। মনে হচ্ছে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। অস্বস্তিতে চোঁচিয়ে উঠল ও, "আমার ভয় করছে নিলীমা!! তুই চলে যা এখান থেকে! আমি খেলব না তোমার সঙ্গে।"

– সে কী তিস্তা, তুই আমার সঙ্গে না খেললে কে খেলবে? আজ জানবি না সত্যিটা? তুই আমার অনেক উপকার করলি রে। তোকে না বলতে পেরে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

ব্র্যাট ভাবছে ওকে যেভাবে হোক ওই ব্যালকনিতে রাকেশবাবুর কাছে যেতে হবে। কিন্তু কিছু করে ওঠার আগেই ও চমকে গিয়ে দেখল নিলীমা দ্রুতপায়ে ওর দিকে এগিয়ে এসে ওকে এক ধাক্কা পাশে সরিয়ে দিয়ে তিস্তাকে ধরে নিজের দিকে ঘুরে দাঁড় করিয়ে দিল। ওই দানবীয় শক্তির কাছে ব্র্যাট নিজেই অসহায়। তিস্তাও ভয় পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চিৎকার করতে লাগল। ওর কাছে এই অদৃশ্য শক্তি আরও ভয়ানক।

নিলীমা শান্তভাবে তিস্তার দিকে চেয়ে বলল, "ভয় পাস না তিস্তা। তোর কোনও ক্ষতি আমি করব না। কিন্তু আমার প্রতিশোধের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। এই দিনটার জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম।"

এই বলেই তিস্তাকে ছেড়ে দিয়ে নিলীমা সোজা গিয়ে দরজায় ভয় পেয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুদেবের গলা টিপে ধরল। হাতের চাপে সুদেবকে দেওয়ালে ঠেসে ওপরের দিকে তুলতে লাগল। প্রবল চিৎকারের মধ্যে সুদেব গলায় হাত দিয়ে ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল সেই অদৃশ্য হাত। তিস্তা মাটিতে বসে পড়েছিল। কিন্তু অবাক হয়ে তাকাল মাটি থেকে দেওয়াল বেয়ে কিছুটা ওপরে উঠে যাওয়া সুদেবের দিকে। "সুদেএএএব...." বলে চঁচিয়ে সেদিকে ছুটে কিছুটা কাছে যেতেই আটকে গেল নিলীমার অদৃশ্য হাতের বাধায়। ব্র্যাট পরিস্থিতির আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সুদেবের দিকে যার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসা কাতর চিৎকার প্রতিফলিত হচ্ছে ঘরের প্রতিটা দেওয়ালে...

– নিলীমাআআ.... আ.. আমাকে ছেড়ে দাও.... আমি চাইনি তোমা...

নিলীমা সুদেবকে ওইভাবে দেওয়ালে ঠেসে ধরেই বলতে থাকল,

– ভেবেছিলে আমাকে সরিয়ে দিলেই তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে? ভেবেছিলে রাকেশকে সহজেই ফাঁসিয়ে দেওয়া যাবে? তুমি আমার বন্ধু তিস্তাকে ধোকা দিলে। আর আমি তা জানতেও পারলাম না!

রাকেশবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে সুদেবকে ওই অবস্থায় দেখেই ভয়ে ছিটকে সরে এলেন ব্র্যাটের দিকে। ওঁর মুখের ভাষাই বন্ধ হয়ে গেল এই দৃশ্য দেখে। ব্র্যাট আর অপেক্ষা না করে ছুটে এগিয়ে গেল নিলীমার দিকে, কিন্তু ওর হাতের প্রবল ধাক্কায় ছিটকে পড়ল মেঝেতে। দেখল সুদেবের শরীরটাও দেওয়াল থেকে মেঝেতে এসে পড়ল। সুদেব গলায় হাত দিয়ে ওয়াক তুলতে লাগল। কিন্তু নিলীমা ওকে দম নেওয়ার সুযোগ না দিয়েই সুদেবের দু পা ধরে টানতে টানতে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল ঘরের দিকে। নিলীমার ক্রুদ্ধ আওয়াজ যেন কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে পারে।

ব্র্যাটের মনে পড়ল সেদিনের কথা। এর পরের ঘটনাগুলো ওর জানা। হাতে আর সময় নেই একদম, কিছু একটা করতেই হবে। ব্র্যাট ঘরের মধ্যেই খুঁজতে লাগল কিছু। ছুটে ডাইনিং স্পেস দিয়ে বাইরের বড় বারান্দায় গিয়ে তুলে নিল একটা লোহার চেয়ার। সেটা নিয়ে আবার ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে ঘরে ঢুকল। দেখল সুদেবকে টানতে টানতে ব্যালকনিতে নিয়ে গেছে নিলীমা। বারান্দার বন্ধ দরজার এপারে কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়ছে তিস্তা। ব্র্যাট চঁচিয়ে তিস্তাকে বলল দরজা থেকে সরে যেতে। সে পাশে সরতেই দরজার কাঁচের ওপর চেয়ার দিয়ে তুলে আঘাত করতে লাগল ব্র্যাট। মোটা কাঁচ তাতেও ভাঙল না। এদিকে নিলীমা সুদেবকে তুলে দাঁড় করিয়ে ঠেলে দিয়েছে ব্যালকনির রেলিং-এর দিকে। প্রাণপণে রেলিং আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করছে সুদেব। কোমর থেকে ওর শরীরের বাকি অংশ উপুড় হয়ে ঝুলছে বাইরের দিকে।

ব্র্যাট পিছনে সরে এসে চেয়ারটা হাতে তুলে সজোরে ছুঁড়ে মারল দরজার দিকে। এই আঘাত আর সামলাতে পারল কাঁচের দরজাটা, ভেঙে পড়ল মাটিতে। কিন্তু তিস্তা আর ব্র্যাট ছুটে এগিয়ে যেতে চেয়েও পারল না। এক অশুভ শক্তির বলয় যেন তৈরি হয়েছে নিলীমার চারিদিকে। তাকে ভেদ করে সুদেবের কাছে পৌঁছনোই অসম্ভব। তিস্তার চিৎকার আর তুমুল বৃষ্টির শব্দ ভেদ করেও নিলীমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সুদেবকে ওই অবস্থায় ধরে রেখেই ও রাগী স্বরে বলে যাচ্ছে,

– ঠিক এইভাবেই তো সুদেব? মনে পড়ছে এবার? কী দোষ ছিল আমার বলো তো? রাকেশকে লুকিয়ে তোমার লালসায় সাড়া দিয়েছিলাম বলে আমার এমন সর্বনাশ করলে! আমার কাছাকাছি থাকবে বলেই তো এই জায়গা পছন্দ করেছিলে। ওপরের ফ্ল্যাট কিনলে। কিন্তু চাবি হাতে পাওয়ার আগে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছিলে কেন? না আমাকে শান্তিতে থাকতে দিলে, না আমার বন্ধুটাকে...

সুদেবের কাতর আর্তি শোনা যেতে লাগল ওই অবস্থাতেই,

– আমাকে ছেড়ে দাও নিলীমা... আমার ভুল হয়ে গেছে... আমি দোষ স্বীকার করছি... সেদিন আমার মাথার ঠিক ছিল না... তিস্তা জানতে পারলে কী হবে সেই ভেবে আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম.. কিন্তু বিশ্বাস করো আমি মারতে চাইনি তোমায়... শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম... কিন্তু হঠাৎ করে হাত ফসকে... আমাকে ছেড়ে দাও... তিস্তার কথা ভেবে আমায় ছে...

ব্র্যাট দেখল নিলীমা আরও শক্তি দিয়ে সুদেবকে নিচে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তিস্তা বারবার চেষ্টা করছে সুদেবের কাছে যাওয়ার। কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কায় যেন এগোতেই পারছে না সেদিকে। দর্শক হয়ে এইভাবে দেখতে হবে নিজের ভালোবাসার মানুষকে চলে যেতে! সুদেবের কথাগুলো বিশ্বাস করতে না পেরে তিস্তা অবশ্যই বসে পড়ল ব্যালকনির অন্য পাশে।

ব্র্যাটের মাথা কাজ করছে না এই মুহূর্তে। নিজেকে বড্ড অসহায় লাগছে। সুদেবকে কি এইভাবেই হারিয়ে ফেলতে হবে নিজের জীবন থেকে! কলেজের বেস্ট ফ্রেন্ড সুদেব। সেই কিনা আজ চোখের সামনে এইভাবে..

নিলীমার গলা ভেসে আসছে আবার।

– তোমাকে ছেড়ে দিলে আমি তো মুক্তি পাব না সুদেব... যে কষ্ট আমি পেয়েছি তার স্বাদ তোমাকেও দিতে চাই যে। আমায় এখান থেকে ফেলে দিয়ে তুমি মুক্তি পেয়েছিলে। ভয়ে পালিয়েও গিয়েছিলে কলকাতা ছেড়ে। আজ আমরা দুজনে একসঙ্গে পালিয়ে যাব এখান থেকে... দুজনেই মুক্ত হয়ে যাব... হা হা হা...

তিস্তা চাঁচিয়ে উঠল এইসময় ব্র্যাটের পাশ থেকে,

– ওকে ছেড়ে দে নিলীমা! ওর শাস্তি আমাকে দিতে দে। তোর বন্ধু হয়ে এইটুকু আমাকেই করতে দে...

ব্র্যাট দেখল নিলীমা হঠাৎ ঘুরে তাকাল তিস্তার দিকে। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে সুদেবের শরীরটা রেলিং থেকে টেনে তুলে এনে ছুঁড়ে ফেলল ব্যালকনির অন্য কোণে। সুদেবের শরীরটা ওইভাবেই মেঝেতে পড়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। নিলীমা ধীর পায়ে এগিয়ে এল তিস্তার দিকে। ওর কাছে এসে বলল,

– নিজের সবচেয়ে ভালো বন্ধুর খুব বড় ক্ষতি করে ফেলতে যাচ্ছিলাম। সুদেব ওর শাস্তি পেয়ে গেছে তিস্তা। তুই আমায় মুক্তি দিলি। ভালো থাকিস বন্ধু...

হঠাৎ একটা ধুলো ভর্তি ঝোড়ো হাওয়া এসে ব্যালকনিতে ধাক্কা মারল। হাওয়ার দাপটে ব্যালকনির মেঝেতেই ছিটকে পড়ল ব্র্যাট আর তিস্তা। চোখ ঢেকে গেল ধুলোয়। ব্র্যাট কোনোরকমে আবার বসে চোখ খুলে কচলে দেখল নিলীমা আর নেই বারান্দায়। বাইরের বৃষ্টির দাপটও যেন হঠাৎ কমে গেছে অনেকটা। পাশে তিস্তাকেও ধরে উঠে বসালো ব্র্যাট। তিস্তা বসে তাকালো ব্যালকনির অন্য প্রান্তে পড়ে থাকা সুদেবের দিকে। এক রাতেই একটা সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে আজ দূরত্ব বেড়ে গেল মাইলখানেক। একটা ঝড় এসে যেন তছনছ করে দিয়ে গেল সব বাঁধন। কয়েক হাত দূরে শুয়ে থাকা অসহায় মানুষটাকে আজ বড়ই অচেনা লাগছে তিস্তার। বিশ্বাস ভাঙলে তা আর বোধহয় জোড়া লাগানো যায় না।

ব্র্যাট জিজ্ঞাস করল তিস্তাকে, "তোর লাগেনি তো কোথাও?"

তিস্তা কোনও জবাব দিল না। শুধু তাকিয়ে রইল সুদেবের দিকে। সুদেব কোনোরকমে উঠে বসল মাথা নীচু করে। যে আঘাত আজ ওর ওপর নেমে এল, তার আশাই হয়তো করেনি ও। কাঁপা কাঁপা গলায় শুধু বলল, "আই অ্যাম সরি তিস্তা।"

তিস্তা কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুদেবের দিকে। তারপর ব্র্যাটের দিকে চেয়ে বলল, "ব্র্যাট, আমি কথা দিয়েছি নিলীমাকে যে সুদেবের শাস্তি আমিই দেব।"

– মাথা ঠান্ডা কর তিস্তা। এটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে।

তিস্তা উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে যেতে লাগল সুদেবের দিকে। ব্র্যাট বসে থেকেই ওর হাত ধরে বাধা দিতে চাইল, "পাগলামো করিস না তিস্তা। সুদেব দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। ওর শাস্তি ও পেয়ে গেছে তিস্তা। তুই ঘরে চা।"

তিস্তা ব্র্যাটের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওর দিকে না তাকিয়েই বলল, "এই হিসেবটা আমাদের বুঝে নিতে দে ব্র্যাট। এর মধ্যে আসিস না।"

ব্র্যাট নিরুপায় হয়ে ওকে ছেড়ে দিল। তিস্তা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সুদেবের সামনে। সুদেব মাথা নীচু করে আবার বলল, "আমাকে মার্জনা করে দিও তিস্তা। অনেকবার ভেবেছিলাম তোমাকে সব বলে দেব। কিন্তু সাহস পাইনি। ভাবতে পারিনি এইভাবে সব..."

সুদেবের বিলাপের মাঝেই তিস্তা ঘুরে তাকালো ব্র্যাটের দিকে। ওখান থেকেই বলল, "ব্র্যাট, তোর বন্ধুকে বলিস সবচেয়ে বড় শাস্তিটা ওর এখনও পাওয়া বাকি। নিলীমাকে কথা দিয়েছি। সেই কথা তো রাখতেই হবে।"

ব্র্যাট কিছু বলার আগেই তিস্তা ব্যালকনির রেলিং-এ পা দিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইরের দিকে...

Conceptualised, Managed and Marketed by:  
**AmbujaNeotia**

# THE ADDRESS OF A BETTER LIFE

Welcome to *Usshar - The CondoVille*. By the rippling waters of the Ganges, amidst lush greenery. In a serene and well-connected neighbourhood, an aesthetically designed development packed with modern-day amenities. A safe and secure abode, specially designed to make your kids joyful and the elderly feel cared for. Where a happy, healthy and active life awaits you. *Usshar - where nature creates the music of life and Ambuja Neotia creates the melody of happy living. Together, we gift you a symphony called home!*

\*  
2 BHK 27 LACS\*  
3 BHK 35 LACS\*  
ONWARDS

TAXES AND OTHER CHARGES EXTRA  
- 1% GST

**USSHAR**  
THE CONDOVILLE

[www.ussnar.com](http://www.ussnar.com)

HIRA/P/SOU/2020/001067 | [www.hira.wb.gov.in](http://www.hira.wb.gov.in)

**Call: 96745 07997**

# পি-3-বি

## অগ্নিভ সেনগুপ্ত

### ১৭ই আগস্ট

প্রায় পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল অবশেষে পেলাম। আমার ইউনিট্রান্স আজ প্রথম সিগন্যাল পাঠাল ব্রহ্মান্ডের বিভিন্ন কোণায়। সাধারণ ট্রান্সমিটারের চেয়ে আমার এই যন্ত্র যে হাজারগুণ বেশী কার্যকর, তা খুব শিগ্গিরই প্রমাণ হবে, এই আমার বিশ্বাস।

প্রথমত, ইউনিট্রান্সের সিগন্যালের গতিবেগ আলোর গতির পঞ্চাশগুণ। সুতরাং, গন্তব্যে সিগন্যাল পাঠাতে অন্যান্য ট্রান্সমিটারের তুলনায় এই ট্রান্সমিটারের অনেক সময় লাগবে।

দ্বিতীয়ত, এই বিশেষ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ যেকোন জৈব পদার্থের সংস্পর্শে এলে বিশেষ এক রেডিওমার্কিং-এ সক্ষম, যা আমার তৈরী এই বিশেষ ট্রান্সমিটার সহজেই পাঠোদ্ধার করতে পারবে। তাই, আমার এই ট্রান্সমিটারের দৌলতে অন্যান্য গ্রহে প্রাণের স্পন্দন শুনতে পাবো, সে বিকাশের যে স্তরেই থাকুক না কেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের প্রতিবেশী সৌরমন্ডলে, আমাদের গ্রহ থেকে মাত্র চার-পাঁচ আলোকবর্ষ দূরেই কোন গ্রহে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। আমার শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে আমি পরিষ্কার দেখেছি, সেই গ্রহের রং গাঢ় নীল। আমি নিশ্চিত, জলের প্রাচুর্যই সেই নীল রঙের উৎস। আর, জল থাকলে প্রাণের অস্তিত্ব থাকাটা আশ্চর্যের নয়।

কেন জানি না, ওই নীল গ্রহের প্রতি একটা অদ্ভুত টান অনুভব করছি। বলা যেতে পারে, ওই নীল গ্রহই আমার এই ইউনিট্রান্স তৈরীর প্রধান অনুপ্রেরণা। ছেলেমানুষি হতে পারে, কিন্তু মনে-মনে আমি ওই গ্রহের একটা নামও ঠিক করে রেখেছি। যেহেতু ওই গ্রহ সৌরমন্ডলের তৃতীয় স্থানে, এবং রং গাঢ় নীল, তাই, PLANET-3-BLUE, বা পি-3-বি।

### ২০শে আগস্ট

আজ সকাল থেকে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। টেলিপ্যাথিক ব্রডকাস্টিং-এ রেড অ্যালার্টের সিগন্যাল অনবরত বেজে চলেছে। দেশের এক প্রান্তে রোবটরা আবার হিংসা ছড়াচ্ছে। এখন প্রায় প্রত্যেকদিনই এই টাফা গ্রহের কোন না কোন প্রান্ত থেকে রোবটদের হিংসার খবর আসতে থাকে। ভুলটা আমাদেরই, নিজেদের কাজ কমাতে আমরাই রোবটদের এতোটাই উল্লত করেছি যে এখন তারা আমাদের মতো মানুষদের এই গ্রহের বোঝা বলে মনে করে। দিনের শেষে আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, আমাদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে খাবার খেতে হয় - যা ওদের কাছে দুর্বলতার লক্ষণ। বুদ্ধিতে ওরা এখনো আমাদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে, কিন্তু সংখ্যায় আমাদের ছাপিয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। আমাদের জীবনধারণকে সহজ ও আরামপ্রদ করতে আমরাই ওদের হাতে অনেক শক্তি তুলে দিয়েছি, যার কুফল এখন আমরা ভোগ করছি।

এই গ্রহ কিছুদিনের মধ্যেই রোবটদের অধীনে চলে যাবে, সেখানে আমাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। ইতিমধ্যেই ওরা সরকারী উদ্ভপদে নিজেদের জায়গা করে নিতে শুরু করেছে। আর কয়েক বছর, তারপর গ্রহের নীতি-নির্ধারণ ওরাই নিয়ন্ত্রণ করবে। এমন দিন আসার আগেই নিজেদের বাঁচাতে আমাদের গ্রহান্তরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, অন্য কোন উপায় নেই। আমার স্থির বিশ্বাস, ওই নীল গ্রহই আমাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থান হতে চলেছে। অধীর অপেক্ষায় বসে আছি, কখন আমার ইউনিট্রান্সে সিগন্যাল আসবে ওই গ্রহ থেকে।

### ২৩শে আগস্ট

আজ বাধ্য হয়ে একটা বেআইনি কাজ করে বসলাম। PRLAD-এর মাদারবোর্ডে আমার আবিষ্কৃত SOUL লাগিয়ে দিলাম।



PRLAD আমার দৈনন্দিন কাজে সাহায্যকারী পলিফাংশনাল রোবট। SOUL, বা Source Of Uninterrupted Lightwave-এর কাজ হচ্ছে এক বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে আলোকতরঙ্গ তৈরী করা, যা রোবটের অভ্যন্তরীণ সার্কিটের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভকে এক বিশেষ আকার দিতে সক্ষম। সেই তরঙ্গ, যার নাম আমি দিয়েছি Wave of Empathy বা সহানুভূতি তরঙ্গ, যন্ত্রের মধ্যেও আমাদের মতো ভাবনার বিকাশ করতে পারবে, যন্ত্রের কার্যকারীতাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না করে। বিনা অনুমতিতে রোবটের সার্কিট রদবদল করা দন্ডনীয় অপরাধ, তা আমি ভালোমতোই জানি। রোবোটিক আইন প্রণয়নকারী বিভাগের, যা বকলমে রোবটরাই পরিচালনা করে, তাদের ধারণা, যন্ত্র যদি আমাদের মতো চিন্তা করতে পারে, তাহলে তার কর্মক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু, আমাকে এই ঝুঁকি নিতেই হতো।

PRLAD-এর মধ্যে আমি বিশেষ নমনীয়তা আগেই লক্ষ্য করেছি, যা অন্যান্য পলিফাংশনাল রোবটের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়না। তাই, এই SOUL ওর মধ্যে যে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে, তা প্রায় নিশ্চিত। ওই নীল গ্রহে যদি আমাদের মাইগ্রেট করতেই হয়, তাকে আমাদের বসবাসের উপযোগী করে তুলতে রোবটের সাহায্য আমাদের লাগবেই। তাই, কিছু বিশেষ রোবটের মধ্যে আমার এই প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যস্বাবী।

আর, সবচেয়ে বড় কথা, PRLAD-এর উপরে আমার কেমন যেন মায়া পরে গেছে। ওকে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একা ছেড়ে আমি অন্য কোথাও যেতেও পারব না।

## ২৬শে আগস্ট

দুঃসংবাদ। আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধু ও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভিক-২৫৪ রোবটদের হাতে ধরা পরেছে। ও আমারই মতো রোবটদের মধ্যে সহানুভূতি ইঞ্জেক্ট করার এক যন্ত্র নিয়ে কাজ করছিল। আমাদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক তথ্য আদান-প্রদান হয়েছে, কথাবার্তা হয়েছে বহুবার। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ভিকের মেমোরী স্ক্যান করবেই, আর সাথে সাথে আমার রিসার্চের যাবতীয় খুঁটিনাটি জেনে যাবে। ভাবতেই সারা শরীর ভয়ে শিউরে উঠছে। আমার ধরা পরে যাওয়াটা মাত্র সময়ের অপেক্ষা। পি-৩-বি থেকে এখনো কোন সংকেত আসেনি, কিন্তু খুব শিগগিরই আমাকে এই গ্রহ ছাড়তে হবে। কোথায় যাব, কি করব, ভাবতে পারছি না।

কিভাবে জানি না, PRLAD আমার মনের অবস্থা বুঝে ফেলেছে। আজ সকালে ভিকের খবরটা পাওয়ার পরেই দেখছি ও আমার মহাকাশ যাত্রার স্যুটটা বার করে পরিষ্কার করতে শুরু করেছে। সাধারণতঃ, ওর মতো রোবটরা নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ করতে অক্ষম। মনে হচ্ছে, আমার SOUL-এর প্রভাব। এবং, যদি তাই হয়, তাহলে এইটা মানতেই হবে যে যন্ত্রটা প্রত্যাশার থেকে বেশী কার্যকারীতা দেখিয়েছে।

## ৩০শে আগস্ট

আজ টাফা ছাড়লাম। ওই গ্রহে থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। নিজের জন্মস্থান, নিজের কর্মস্থান, নিজের হাজার স্মৃতি - সব ছেড়ে সারা জীবনের মতো চলে যাওয়া। গলুব্য, অবশ্যই ওই নীল গ্রহ। না, এখনো ওই গ্রহ থেকে প্রাণের কোন সংকেত পাইনি। বলা যেতে পারে, শুধুমাত্র নিজের বিশ্বাসের উপরে আস্থা রেখেই একটা ঝুঁকি নিলাম। সঙ্গে একটা পোর্টেবল ইউনিট্রান্স নিয়ে নিয়েছি, যাতে কোন সিগন্যাল এলে রিসিভ করা যায়। আপাতত, যতদিন না সিগন্যাল আসে, টাফার মহাকাশ-সীমানার বাইরে অপেক্ষা করতে হবে।

PRLAD-কে সঙ্গে নিয়েছি। ওর মধ্যে আমাদের মতো মনের বিকাশ হয়েছে কি না জানিনা, যান্ত্রিক অভিব্যক্তি থেকে বোঝা দুষ্কর। কিন্তু, ওর মধ্যে কিছু পরিবর্তন যে এসেছে, তা খুব স্পষ্ট। বারবার স্পেশ ক্যাপসুলের জানলা দিয়ে বাইরে দেখছে, মনে হয় নিজের গ্রহের জন্যে মন খারাপ হচ্ছে। আপাতত আলোর গতির কুড়িগুণ বেগে আমাদের স্পেশ ক্যাপসুল ছুটেছে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই টাফার টান কাটিয়ে আমরা মহাশূণ্যে পৌঁছে যাব - চিরদিনের মতো।

আমার গ্রহ, তুমি ভালো থেকো। জানি কোনদিন সম্ভব হবে না, তাও ইচ্ছা রইল, তোমার কাছে যেন আবার কোনদিন ফিরে আসতে পারি।

## ২রা সেপ্টেম্বর

অবশেষে! আমার বিশ্বাসের জয় হয়েছে। পি-3-বি থেকে সিগন্যাল এসেছে, এবং তা ইতিবাচক। ওই গ্রহে প্রাণ আছে। তা বিকাশের কোন পর্যায়ে আছে, তা জানিনা। কিন্তু, ওই গ্রহ প্রাণধারণের উপযোগী, তা নিশ্চিত। আমরা এখন ওই গ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছি।

আর মাসখানেকের মধ্যেই আমরা পি-3-বি-র বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করব। কিন্তু, কয়েকটা কারণে দুশ্চিন্তায় আছি।

প্রথমত, টাফা থেকে খবর পেলাম যে ভিকের মেমোরী স্ক্যান করে পুলিশ আমার আবিষ্কারের খোঁজ পেয়ে গেছে। আমার বাড়িতে তল্লাশি হয়েছে, এবং আমার যাবতীয় রিসার্চ বাজেয়াপ্ত করেছে। ওরা এটাও খবর পেয়েছে যে আমি মহাকাশে পাড়ি দিয়েছি। এখন ওদের কাছে আমি মোস্ট ওয়ান্টেড এক পলাতক আসামী। টাফার সৌরমন্ডল পেরিয়ে গেলে ওদের ট্র্যাকিং ডিভাইজ আর আমার খোঁজ পাবেনা। তাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ওদের আওতার বাইরে যেতে হবে। কিন্তু, যতক্ষণ না আমাদের সৌরমন্ডল পার করছি, ততক্ষণ ধরা পরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়ত, পি-3-বি-তে কি ধরণের প্রাণ আছে, সেই সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। তারা আমাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, নাকি শত্রু হিসাবে, তাও জানি না। ভেবেছিলাম, ওই গ্রহে যাওয়ার আগে এই নিয়ে একটা বিস্তারিত গবেষণা করব। কিন্তু, এই পরিস্থিতিতে ওই ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা নেই।

তৃতীয়ত, আমি এইটাও জানিনা যে পি-3-বি ম্যাটার দিয়ে গঠিত, নাকি অ্যান্টি-ম্যাটার দিয়ে। আমাদের যাবতীয় বস্তুর বিল্ডিং ব্লক ম্যাটার। যদি পি-3-বি-র বিল্ডিং ব্লক অ্যান্টি-ম্যাটারের হয়, তাহলে ওদের বায়ুমন্ডলে ঢোকানোর সাথে সাথেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। ওই গ্রহে কোন বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশ হয়ে থাকলে এই তথ্যটা আমরা সহজেই নির্ধারণ করতে পারতাম। কিন্তু, ওখানকার প্রাণীরা কোন স্তরে আছে, তা আমি জানি না। সুতরাং, এখনকার পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র ভাগ্যের উপরে ভরসা করেই আমাকে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

অবশ্য, একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই আবিষ্কারের উত্তেজনা আমার সমস্ত ভয়কে মাং দিয়ে দিচ্ছে। যদি মৃত্যুও হয়, তাহলেও একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে এর থেকে সুখের মৃত্যু কি বা হতে পারে?

## ৩ অক্টোবর

বিগত এক মাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নি। আমি PRLAD-এর উপরে স্পেশ ক্যাপসুল পরিচালনার ভার দিয়ে হাইবারনেশনে গেছিলাম অক্সিজেন ও খাদ্যসামগ্রীর ব্যবহার কমাতে। নতুন গ্রহে কি ব্যবস্থা পাব, জানি না। তাই, মূল্যবান সম্পদ বুক্বে-শুনে খরচ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখন আমরা পি-3-বি-এর কক্ষপথ থেকে মাত্র কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে। কালকের মধ্যেই আমরা গ্রহের বায়ুমন্ডলে ঢুকে পড়ব। আমার গণনা অনুযায়ী কক্ষপথে আমাদের সাতবার ঘুরতে হবে ল্যান্ড করার আগে। প্রতি ঘূর্ণনে আমরা একধাপ করে ওই গ্রহের কাছে এসে পড়ব।

সকলে বলে, বিজ্ঞানের মানদণ্ড শুধুমাত্র যুক্তিনির্ভর। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নাকি আবেগ থাকতে নেই। কিন্তু, একজন বৈজ্ঞানিক হয়েও উত্তেজনায় হাত কাঁপছে কেন? অ্যান্টি-ম্যাটার, ভিনগ্রহের বাসিন্দাদের ব্যবহার ইত্যাদি চিন্তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে ওই নীল গ্রহের অমোঘ আকর্ষণ। আস্তে আস্তে আমরা আরো কাছাকাছি এসে পরছি। এক এক করে গ্রহাণুর পাশ কাটিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে আমাদের স্পেশ ক্যাপসুল, এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে।

নাঃ, আর লিখতে পারছি না।

## ৪ অক্টোবর

পি-3-বি-এর কক্ষপথ ধরে তিনবার ঘুরেই আমাদের মহাকাশযান ঢুকে পরেছে গ্রহের বায়ুমন্ডলে। যথারীতি, দুশ্চিন্তায় আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল এক প্রবল বিস্ফোরণের আশঙ্কায়। শেষ মূহুর্তের অনিশ্চয়তায় মহাকাশযানের সেন্স ডেস্ট্রাকশন সুইচটায় হাত চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা যান্ত্রিক শব্দ শুনে পিছনে ফিরে দেখি, PRLAD জোরে জোরে মাথা নাড়ছে। মাথা নাড়াটা অনেকটা আমাদের "না" বলার মতো। ও কি আমাকে বারণ করছে? আমার আবিষ্কৃত SOUL-এর উপরে সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই বলতে পারি, যন্ত্রমানব হিসাবে এতোটা বিচারবুদ্ধি ওর থেকে আশা করা যায় না। কিন্তু, কেন জানি না, ওর ওই বারণকে উপেক্ষা করতে পারলাম না।

ধ্বংস যদি হতেই হয়, তাহলে নাহয় ওই নীল গ্রহের বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করেই ধ্বংস হব। নিজেকে ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিয়ে মহাকাশযানের গতিপথ ঘুরিয়ে দিলাম পি-3-বি-এর কেন্দ্রের দিকে।

কিন্তু, না, কোন অঘটন ঘটল না। এই গ্রহও আমাদের মতো ম্যাটার দিয়েই গঠিত। আর কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে আমরা ল্যান্ড করব। ওখানে আমাদের জন্যে কি অপেক্ষা করে আছে, জানি না।

## ৫ অক্টোবর

পি-3-বি-তে নামার প্রস্তুতি শেষ। এই গ্রহের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে কয়েকটা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছি, যা লিপিবদ্ধ করে রাখা দরকার।

প্রথমত, এই গ্রহের মোটামুটি তিনভাগ জল, একভাগ স্থল।

দ্বিতীয়ত, সম্ভবত এখানে বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করে। আমি ইথারনেটের সাহায্যে এদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। তাই, আমার ধারণা, এরা বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নত ভাষা এদের আয়ত্তে এখনো আসেনি।

কিন্তু, আমি আমার শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে দেখে যা বুঝেছি, এরা কৃষিকাজ ও সমাজ গঠনের মতো মৌলিক ধাপগুলো আয়ত্ত করেছে।

তৃতীয়ত, আমার ধারণা এখানকার বাসিন্দারা বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল। আমার যত্নে কিছু পজিটিভ ওয়েভ সনাক্ত করেছি, যা ওই গ্রহের সম্মিলিত এনার্জি ওয়েভের নির্দেশক। তাই, কিছু নেতিবাচক ওয়েভ থাকলেও তা ইতিবাচক ওয়েভের তুলনায় নগণ্য।

সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, এই গ্রহ আমাদের বাসস্থান হিসাবে যোগ্যতম।

আমাদের মহাকাশযান ল্যান্ডিং-এর জন্যে তৈরী। একটা নির্দিষ্ট স্থান বাছাই করেই রেখেছিলাম, জলের উৎস থেকে যা বেশী দূরে নয়। কো-অর্ডিনেট দিতেই ডিসিলারেশন শুরু হল। মহাকাশযানের রোবোটিক কন্ট্রলসে কাউন্টডাউন চলছে..টেন..নাইন..এইট..সেভেন..সিক্স..ফাইভ..ফোর..থ্রি..টু..ওয়ান...টাচডাউন!

\*\*\*\*\*

ত্রৈলোক্যবাবু প্রতিদিনের অভ্যাসমতো উশীর ধার থেকে হেঁটে ফিরলেন। উনি এখানকার সবচেয়ে পুরানো বাসিন্দা। তাই, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই ওনাকে চেনে। বলা যেতে পারে, এই প্রাতঃভ্রমণটা ওনার প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নেওয়ার একটা অজুহাত মাত্র। বাড়ি ঢুকে ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে প্রত্যেকদিনের মতো খবরের কাগজটা তুলে নিলেন। প্রহ্লাদ কফির কাপটা টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে গেল।

হঠাৎ চার নম্বর পাতার একটা ছোট্ট খবরে ত্রৈলোক্যবাবুর চোখটা আটকে গেল।

**স্টাফ রিপোর্টার:** কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আবার ইউ-এফ-ও দৃশ্যমান হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী এক ক্যাপসুলের মতো যান তাঁরা রাতের আকাশে দেখতে পেয়েছেন। সাধারণ প্লেন বা অন্যান্য পরিচিত আকাশযানের থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। বৈজ্ঞানিকরা অবশ্য এই খবরকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির এক বৈজ্ঞানিক জানালেন, "অন্য গ্রহে প্রাণ আছে কি না, তা এখনো আমাদের জানা নেই। কিন্তু এই ইউ-এফ-ও দর্শন নেহাতই এক ইলিউশন।"

সত্যি? নাকি ভিনগ্রহের উন্নত প্রাণীরা আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে আমাদের গ্রহে?

ত্রৈলোক্যবাবু খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের উপরে রাখতে-রাখতে একটু মুচকি হাসলেন। তারপর প্রহ্লাদকে আর-এক কাপ কফি বানাতে বলে ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে চোখটা বন্ধ করলেন।

## মগজাপ্ত বাঁধা পড়েছে সরকারের কাছে..

**চন্দন সেন** - বাংলা নাটকের আঙিনায় এক স্বনামধন্য চরিত্র, এক বহুল-পরিচিত মুখ। থিয়েটার, সিনেমা, টিভি সিরিয়াল - সবেতেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাঁর সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় ছিলেন **প্রাণেশ চট্টোপাধ্যায়**।

### আপনার নাট্যজীবনের শুরু কিভাবে?

গণনাট্য সংঘে শিশু শিল্পীর ভূমিকায় শুরু, তারপর রমাপ্রসাদ বণিকের 'চেনামুখ'-এ এসে রানিকাহিনী, পাখি, ইচ্ছেগাড়ি - এসব নাটকে অভিনয়। বছর ছয়েক পরে উৎপল দত্ত'র PLT থিয়েটার গ্রুপে ঢাকা এবং সেখানে কল্লোল, লাল দুর্গা, আফিম প্রভৃতি নাটকে অভিনয়। উৎপল দত্ত'র অকালপ্রয়াণের পরে আবার রমাপ্রসাদ বণিকের সঙ্গে কাজ শুরু। আমি প্রথম নাট্যনির্দেশনার কাজ করি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে ১৯৮১ সালে এবং তারপরে জাঁ পল সার্তের 'Dirty Hands' নাটকে ১৯৮২ সালে। ১৯৯৭ সালে যোগ দিই থিয়েটার গ্রুপ 'নাট্যআনন'-এ সৃজনশীল পরিচালক হিসেবে। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে নিউ ইয়র্কে অফ ব্রডওয়ে শো'তে পরিচালক সুদীপ্ত চ্যাটার্জীকে নাটক মঞ্চস্থ করতে সহায়তা করি।

### আপনার শিক্ষাগুরু কে এবং প্রধান শিক্ষা কি পেলেন?

উৎপল দত্ত ও রমাপ্রসাদ বণিক আমার অভিনয় ও নাট্যমঞ্চের গুরু। এঁদের অনুপস্থিতিতে, বিশেষ করে, রমাপ্রসাদ বণিকের চলে যাওয়াতে আমার জীবনে এক বড় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র হিসেবে রমাপ্রসাদ বণিকের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিটি মুহূর্তকে গভীরভাবে বার বার দেখা - অভিনয়ের মাধ্যমে মুহূর্তের নৈঃশব্দকে কতটা বাস্তব করে তোলা যায়। এই শিক্ষা কাজে লাগিয়েছিলাম সোহাগ সেনের 'পাপ' নাটকে, দেড় ঘন্টার নাটক, ১৫টি মাত্র সংলাপ - সেখানে নৈঃশব্দের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অনবদ্য। নির্দেশকের চিন্তা-ভাবনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে গেলে একজন অভিনেতাকে নৈঃশব্দের ব্যবহার সঠিক ভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

### আপনি নিজে কোনটায় বেশি স্বচ্ছন্দ বলে মনে করেন - অভিনয়ে না নির্দেশনায় ?

অভিনয় করতে খুব ভালো লাগে, অন্তর থেকে করি। নির্দেশনার কাজ করেও আনন্দ পাই। কিন্তু এখন নির্দেশনা করতে গিয়ে টের পাই জীবনে কত ফাঁকি দিয়েছি, কত কিছু জানি না তার প্রমাণ পাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। এর আগে শুধুই অনুশীলন করে গিয়েছি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কোথায় কোথায় ভুল করেছি। আপনারা হয়তো বলবেন এটা আমার 'modesty', আসলে কিন্তু তা নয়, এ আমার উপলব্ধি। আজ পর্যন্ত ১৪/১৫ টা নাটক অনুবাদ করেছি, লিখেছি একটা নাটক। নির্দেশনার বোধটা তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে। যত বয়স বাড়ছে বুঝতে পারছি কি পরিমাণ ফাঁকিবাজি করেছি। কতটা জানি না সেটা এখন বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছি। নির্দেশনার কাজে আমি খুব আনন্দ পাই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সবেমাত্র এখন নির্দেশনার কাজটা একটু আধটু বুঝতে পারছি। আমার ওপর রমাপ্রসাদ বণিক ও উৎপল দত্তের প্রভাব আছে। সুনীল গঙ্গুলী আমাকে বলেছিলেন যে 'সারাজীবন ধরে ভাবলাম ওই দেড়লটাকে (রবীন্দ্রনাথ) অস্বীকার করবো, কিন্তু কখনো পারি নি।' আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে একটা নাটক করেছিলাম (নাম 'যুগনায়ক') - স্ক্রিপ্ট লেখার সময় 'প্রথম আলো বইটি থেকে কিছু কিছু তথ্য নিয়েছিলাম - তাই সুনীল গঙ্গুলী নাটকটি দেখতে এসেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার ওপর উৎপল দত্তের প্রভাব অপরিসীম - এটা যাবে না কখনো।' উৎপল দত্ত বলেছিলেন যে 'ওই তিনটে লোকের জন্য সব গেল - রবীন্দ্রনাথ, শেখরপিয়র আর ও 'নিল। যাই করি, যাই ভাবি, দেখি এনারা তিনজনে সেসব অনেক আগেই লিখে বা ভেবে বসে আছেন'।

### মঞ্চসফল অভিনয় বলতে আপনি কি বোঝেন ? কোনো উদাহরণ ?

'গরুর গাড়ির হেডলাইট' - এই নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার পর প্রথম দু'বছর বাদে তার পরের ১৬টি বছর ধরে হাউসফুল শো হয়েছে। মঞ্চসফলতা বোঝানোর জন্য এর চেয়ে বোরো উদাহরণ আর কি হতে পারে? প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি যে এই নাটকের প্রথম ৩টি শোয়ে আমার মা অভিনয় করেছিলেন, তারপর সাগরিকা বলে একজন টানা আঠারো বছর ধরে এই নাটকটিতে অভিনয় করে গেছেন।

# স্বপ্ন দেখতে আজো ভালো লাগে

## বিদিশা ব্যানার্জী

স্বপ্ন দেখতে কার না ভালো লাগে? বেশীরভাগ মানুষই স্বপ্ন দেখেন, ঘুমের মধ্যে। ঘুম ভাঙলো, স্বপ্ন ফুরুং করে বাড়ির দক্ষিণের জানলা দিয়ে উড়ে গেল। চা-জলখাবার, খবরের কাগজ, বাজারের ব্যাগ, মিনিবাসে ধাক্কাধাক্কির রোজনামচার মধ্যে রঙিন সুন্দর স্বপ্নের প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু, আব্দুল কালাম যে বলেছিলেন, "Dream is something which keeps you awake"? ভাবতাম, এ কেমন স্বপ্ন যা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না?

ছোটবেলায় মায়ের শাড়ি-কাজল-টিপ নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে খেলতে খেলতে সেই ঘুম-ভাঙানিয়া স্বপ্ন যে কখন আমার চোখেও ঢুকে গেছে, তা টের পাইনি।

তখন সবে বয়ঃসন্ধির গন্ডীতে পা রেখেছি। শখ হল, মডেলিং করব। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাড়িতে যেমন হয় আর-কি, বাড়িতে কথাটা পাড়তেই মায়ের গম্ভীর আদেশ, "পড়াশুনাটা মন দিয়ে কর। আমাদের মতো পরিবারে ওইসব সৌখিনতা মানায় না।" যদিও আমার মা-বাবা পড়াশুনার পাশাপাশি গানবাজনা চালিয়ে যেতে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন, কিন্তু প্যাশনকে প্রফেশন হিসাবে নেওয়ার ঝুঁকিতে আমাকে ঠেলে দিতে চান নি। অন আ রেট্রোস্পেক্ট, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে এখন মনে হয়, একদম ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন।

অগত্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং। তারপর এক বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি, এবং সেই সূত্রে মুম্বাই-গমন। সেই মুম্বাই, যেখানে নাকি প্রত্যেকদিন হাজার-হাজার মানুষ একরাশ স্বপ্ন চোখে নিয়ে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে (অধুনা, ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস) নামে। এমন স্বপ্নের নগরীতে আমার চেপে রাখা স্বপ্নটা হঠাৎ ফিরে এলো। আমি যার সাথে ক্ল্যাট শেয়ার করতাম, সে এক বিখ্যাত ম্যাগাজিনে কাজ করতো। সেই সূত্র ধরেই একদিন ফটোস্যুটে গেলাম, কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। বিশেষ সুবিধা করতে পারলাম না।

মুম্বাইতে আর বিশেষ কোন সুযোগ আসেনি। তার কয়েক মাস পরেই কোলকাতায় ফিরলাম। তারপর, সেখান থেকে চাকরিসূত্রেই নেদারল্যান্ডস যাওয়ার সুযোগ এলো।

আমি যখন নেদারল্যান্ডসে পৌঁছাই, তখন সেখানে বাঙালী কম্যুনিটি ক্রমবর্ধমান। নববর্ষ-উদযাপন, দুর্গাপূজা ইত্যাদি শুরু হয়েছে। গানটা ছোট থেকেই ভালোবাসি, তাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতাম। অভিনয় বা মডেলিং নিয়ে খুব-একটা চর্চা হয়নি। ২০১৯-এ, তখন আমি লন্ডনে ছুটি কাটাচ্ছি, হঠাৎ একটা ফোন এলো। প্রতি বছর পৃথিবীর অন্যান্য অনেক শহরের মতো আমস্টারডামেও আয়োজিত হয় 48 Hours Film Project। সেখানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক দলকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে লটারীর মাধ্যমে নির্ধারিত এক জঁরের উপরে একটা শর্ট ফিল্ম বানাতে হয়। আমার পরিচিত কয়েকজনের ইচ্ছা, তারা সেই বছরে অংশগ্রহণ করবে। সেই সূত্রেই আমার কাছে ফোন, "অ্যাক্টিং করবে?"

অভিনয় আমি কোনদিন করিনি, কিন্তু ওই ফোন আমাকে যেন আবার আমার ছোটবেলার স্বপ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রাথমিক দোনামনা কাটিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে রাজী হয়ে গেলাম।

সেই আটচল্লিশ ঘন্টা যে কি ভাবে কেটে গেল, বুঝতেও পারলাম না। লাইট-ক্যামেরা-টেক-রিটেকের মোড়া যেন এক স্বপ্নের জগৎ। টু বি স্পেসিফিক, আমার ছোটবেলার স্বপ্নের জগৎ। বড়পর্দায় দেখানো হল সেই সিনেমা, সে আর-এক অবিস্মরণীয় অনুভূতি। ওই আটচল্লিশ ঘন্টা আমার স্বপ্নকে আবার বাঁচিয়ে তুললো।

কিন্তু, তার কিছুদিন পর থেকেই পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পরলো মহামারী। ঘরবন্দী হলাম, সাথে বন্দী হলো আমার ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর সাধও। তবু, দু-একটা ভার্সুয়াল শ্যুট করার চেষ্টা করেছি, এবং সেই সূত্রে কিছু শংসাপত্রও জুটেছে।

ততদিনে আমার স্বপ্ন ডানা মেলেছে অনেক দূরে। নেদারল্যান্ডসে থেকে সেই ডানা মেলার আকাশ পাবো না, সেই উপলব্ধি নিয়ে নির্ণয় করে ফেললাম - কলকাতায় ফিরব। সেখানে চেষ্টা করব বাংলা সিনেমার অন্দরমহলে ঢোকার। খুব-একটা সহজ হয়নি সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া। বিদেশের চাকরী, আরামের জীবন ফেলে অনিশ্চয়তায় ঝাঁপ দেওয়া। আশ্চর্যজনকভাবে, মা-বাবা ও বন্ধুবান্ধবদের থেকে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পেলাম। পাঁচ বছরের খিত্ত জীবন থেকে অবসর নিয়ে স্বপ্নের হাত ধরে পথ চলার শুরু। যদিও চাকরীটা ছাড়িনি, ওটা চালিয়ে যাব আপাতত।

রূপালী পর্দার জগতে পা রাখতে গেলে পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় অন্যান্য যেকোন পেশার তুলনায় বেশী বৈ কম প্রয়োজন নয়। সেইভাবে পেশাদার অভিনয় কোনদিন করিনি, তাই প্রথম পদক্ষেপ - অভিনয় শিক্ষা। সবে শুরু করেছি পেশাদার অভিনয় শেখা। এর পাশাপাশি কিছু পেশাদার মডেলিং-এর কাজ, কিছু মিউজিক ভিডিও-র কাজ ইত্যাদি করছি। এই কিছু মাসের অভিজ্ঞতাতেই বুঝেছি, অনেক পরিশ্রম করতে হবে, এবং সহজে হাল ছাড়লে চলবে না।

বলিউডে নেপোটিজম আর ফেভারিটিজম নিয়ে অনেকেই অভিযোগ করেন। এই কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝে গেছি, টলিউডও সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অডিশন দেওয়ার পরে কোন উত্তর আসে না। অবশেষে দেখা যায় যে অডিশনটা শুধুমাত্র আইওয়াশ, কোন চেনা মুখ ইতিমধ্যেই সেই কাজের বরাত নিয়ে বসে আছেন। তা ছাড়া, প্রযোজকদের থেকে বিভিন্ন আপত্তিকর প্রস্তাব তো আছেই।

কিন্তু, আমার বিশ্বাস, সংখ্যালঘু হলেও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নতুন মুখ, ভালো কাজের কদর করেন। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু স্বাধীন চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে, যা আমার এই বিশ্বাসকে শক্তি দেয়। তাই, হাল ছাড়ব না। একদিন না একদিন সুযোগ আসবেই। কবীর সুমনের থেকে কথা ধার করে বলবই, "আমার কিন্তু স্বপ্ন দেখতে আজো ভালো লাগে..."।

## দাদা, আমরাও বাঁচতে চাই অরিন্দম চ্যাটার্জী

ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে খুব একটা চাপ ছিলো না আমাকে নিয়ে। যখন খেলাধুলা করতাম তখনও বাবা-মা support করেছে আর তারপর যখন খেলাধুলা ছেড়ে গানবাজনা করতে আসি তখনও। কিন্তু তাতে কি মাথা ব্যথা বেশি হতে শুরু করে আত্মীয় স্বজনের। নিদেনপক্ষে দশটা-পাঁচটার একটা চাকরি না জোগাড় করতে পারলে তাঁদের সম্মান খোয়া যাবে। যাই হোক, তখন লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বজনদের বিরুদ্ধে গিয়ে সাতাশ বছর আগে গান বাজনা করতে শুরু করি। কয়েক বছর পর থেকে সব কিছু ঠিকঠাক ভাবেই চলতে থাকে। নামকরা শিল্পীদের সঙ্গে বাজাতে শুরু করি। নিজেরও বেশ নাম ডাক হতে শুরু করে। এরপর কায়া তৈরি করি। মানুষজন গান শুনে ভালো বলে। আরো নাম-ডাক হয়, কাগজে ছবি বেরোতে শুরু করে, টিভিতে মুখ দেখাতে শুরু করে। এরপর অনুষ্ঠানের জন্য আমেরিকা থেকে ডাক পাই। যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গানবাজনা করতে শুরু করেছিলাম তাঁরা এতোদিনে জলের আকার ধারণ করেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে জীবনে তো কোনো রোমাঞ্চ থাকে না।

রোমাঞ্চ নিয়ে হাজির হলেন করোনা। ব্যাস, কাজকর্ম সব বন্ধ। অতিমারী বলে কথা। ছয়-সাত মাস পর থেকে বিভিন্ন musicians বন্ধুদের ফোন আসতে শুরু করে, কেউ বউ বাচ্চাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছে, কেউ নিজের গিটার বিক্রি করে দিচ্ছে, কেউ নিজের পাড়াতেই সবজি বিক্রি করেছে এই রকম। আসলে আমরা যারা ফ্রিল্যান্স কাজের সাথে যুক্ত তারা কিন্তু কাজ করলে টাকা পাই না করলে পাই না। আমাদের কোনো পেনশন, ডি-এ, টি-এ নেই। দাঁতে দাঁত চেপে যে লড়াই করে আমরা যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলাম আস্তে-আস্তে দেখতে পাচ্ছি আমরা যুদ্ধ হারতে বসেছি। গত দু-বছরে অনেক musicians নিজের যন্ত্র বিক্রি করে বাইক কিনে বিভিন্ন সংস্কার সাথে যুক্ত হয়ে খাবার বা বিভিন্ন জিনিস ডেলিভারি করেছে। জানি না তারা আর কোনদিন গানবাজনায় ফিরতে পারবে কিনা। এখনো একই সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছি আমরা। এর মধ্যে essential জিনিস যেগুলো সেগুলো হচ্ছে যেমন ধরুন ভোট। লক্ষ লক্ষ লোক প্রচারে জমা হচ্ছে সেখানে করোনাকে বারণ করা আছে আসতে। আর, আমরা যারা non-essential, তাদের অনুষ্ঠানে কিছু লোক জমা হলে করোনা হবে, তাই অনুষ্ঠান বন্ধ। কোনো সরকারের কোনো মাথাব্যথা নেই এই লক্ষ লক্ষ non-essential শিল্পীদের কি হবে। প্রশ্ন গুলো জটিল আর উত্তরও নেই জানা!

**HCL**

# Reimagine the enterprise of tomorrow, today

Enterprises facing technology-led transformation now contend with unprecedented uncertainty. Business, is no longer 'as usual' and has to evolve for immediate disruption, while remaining open to the opportunities of the new normal.

This is why at HCL Technologies, innovative minds collaborate to make you a resilient digital enterprise, empowered with technology for the next decade, today.

[www.hcltech.com](http://www.hcltech.com)

\$10.17 Billion

168,000+ ideapreneurs

50 Countries

# সপ্তমে সপ্তমী

## অর্চনা পাল

মফস্বল অঞ্চলের সপ্তমীর সকাল। প্রায় সাতটা বাজে। নবপত্রিকা স্নানের শোভা যাত্রার আওয়াজ কানে আসছে।

ঠাকুরঘরে ইন্দ্রানী পূজো দিচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে তার নয় বছরের ছেলেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে মাথা গরম তার।

-"এই বুড়ো! বু-ড়ো-ও-ও-ও.... উফ ডেকে ডেকে একটা সাড়া পাওয়া যায় না।

কি গো শুনছওওওওও! ছেলেটাকে কখন থেকে ডাকছি। দেখা তো সাড়া দেয় না কেন? চান করতে পাঠাও। ওকে নিয়ে ঠাকুর-দালানে যাবো তো পূজো দিতে।"

-"এ্যাঁ, কিছু বলছ?"

-"যেমন বাপ তেমনি ছেলে। এতগুলো কথা বলে গেলাম। এখন উনি বলছেন কিছু বলছ! থাক। আমি পূজোটা সেরে আসছি।"

পূজো সেরে ইন্দ্রানী সপ্তমী পূজোর থালা সাজিয়ে রাখে। পাড়ার বারোয়ারী ঠাকুর-দালানে পূজো দিয়ে অঞ্জলি দিতে যাবে ছেলেকে নিয়ে। ছেলের বাবা অবশ্য শুধু অষ্টমীর অঞ্জলি দেয়। এখন চা খেতে খেতে খবরের কাগজের মধ্যে বুঁদ হয়ে আছে সে। ছেলেটাকে ডাকার নাম গন্ধও নেই।

ইন্দ্রানী ঘরে, খাটের নিচে, আলমারির পাশে, চোকির নিচে, বাগানে, ভাড়র ঘরে সর্বত্র খুঁজে বেড়ায় ছেলেকে। কিন্তু বুড়ো কোথাও নেই। এই ওর এক বদ রোগ। দুষ্টুমি করে লুকিয়ে থাকবে। হাজার ডাকেও সারা দেবে না।

ইন্দ্রানী এবার একটু চিন্তিত হলো।

-"আরে শোনো না! ছেলেটা কোথায় লুকায় দেখ না একটু। ঠাকুর-দালানে আর কখন যাবো পূজো দিতে? দেরি হয়ে যাচ্ছে তো।"

-"আরে এঘরে ওঘরে লুকিয়ে আছে দেখ গিয়ে।"

-"আরে সব জায়গায় খুঁজে দেখেই তো বলছি।"

বুড়োর বাবা লম্বা একটা আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়িয়ে পড়ল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে কাঠের রুলারটা বার করে একটু ঠুকে নিল।

-"আজ ওর একদিন কি আমার। রোজ রোজ ওর এই লুকোচুরি আমি বার করছি। ডাকলে উত্তর পর্যন্ত দেবে না!"

এই বু-ড়ো-ও-ও-ও-ও-ও শিগগির বেড়িয়ে আয় বলছি। উত্তর দে!! কিরে!! কোথায় তুই!!"

বুড়োর বাবা কোমড়ে লুঙ্গিটাকে উঁচু করে ডবল করে বেঁধে নিয়ে ছেলে খুঁজতে বের হয়।

ঘর বাড়ি কুয়োতলা চানের জায়গা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বুড়োকে খুঁজে পায় না। বুড়োর পোষা আদরের কুকুর ভোলা এতক্ষণ উঠনে চুপ করে দিবা নিদ্রা দিচ্ছিল। বাবাকে রুলার হাতে বেরতে দেখে সে বেটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বুড়োর বাবার পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগলো সে।

-"এই ভোলা.... তুই সব জানিস আমি জানি। বল না কোথায় লুকিয়েছে রে বুড়ো!"

মুখে কুঁই কুঁই আওয়াজ করে ভোলা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

-"তুমি ব্যাটা বুড়োর ক্রাইম পার্টনার। খুব জানি সেটা। তুমি সব জানো, কিন্তু বলবে না! দাঁড়াও বুড়োকে আগে পাই। তারপর দুজনের পিঠেই কয়েক-মা দেবো!"

ভোলা নিপাট ভালো মানুষ সেজে আবার লেজ গুটিয়ে শুয়ে পড়ল। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখতে থাকে বুড়োর বাবা মায়ের খোঁজাখুঁজি।

-"শোনো তুমি খুঁজতে থাকো। আমি দৌড়ে গিয়ে পূজোর থালাটা দিয়ে আসি। ওকে না হয় পরে অঞ্জলীর সময় এসে নিয়ে যাবো।"

ইন্দ্রানী পূজোর থালায় ফল, মিষ্টি, ফুল, ধূনো সব সাজিয়ে সুন্দর নকশা করা কাপড়ে ঢেকে নিয়ে বেড়িয়ে পরে।



- "বু-ড়ো-ও-ও-ও..... এই বু-ড়ো-ও-ও-ও-ও.... উফ যেমন মা তার তেমনি ছেলে। ছুটির সুন্দর সকালটা এক দন্ড শান্তিতে কাগজ পড়ার জো নেই! উনি সেজেগুজে চলে গেলেন পূজো দিতে। আর আমি এখন সব ছেড়ে ছেলে খুঁজি, ধুতর....!!"  
কল্যাণবাবু রুলারটা টেবিলে ছুড়ে রেখে দিলেন। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে ঢুকে পড়লেন আবার তাতে।  
মিষ্টি শরতের আকাশ বাতাস। ঠাকুর-দালান থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দ মনের মধ্যে অদ্ভুত এক ভালো লাগা তৈরি করে। এ সময়ে সব কিছুই জেনো অকারণেই ভালো লাগতে থাকে।

হস্তদন্ড হয়ে ইন্দ্রানী মিনিট পনেরোর মধ্যে ফিরে এলো।

- "কি গো বুড়ো কই? তুমি আবার কাগজ নিয়ে বসে গেছ!"

- "আমি আর পারছি না। ওই ব্যাটা ভোলা সব জানে। ওকে ম্যানেজ করে জেনে নাও।"

ইন্দ্রানী ঘরের কাপড় বদলে নিয়ে রান্না ঘরে ঢোকে। জলখাবার বানাতে ব্যস্ত হয়।

- "কাকিমাআআ..... কাকা কেমন আছেন আপনারা?"

- "আরে শান্তনু! এসো এসো! একা এলে নাকি?"

- "হ্যাঁ কাকা। ও বাড়িতে একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম দেখা করে যাই আপনাদের সাথে।"

- "খুব ভালো করেছে। বসো বসো। এই শুনছ দাদার জামাই শান্তনু এসেছে গো দেখা করতে।"

- "আ-স-ছি-ই-ই-ই.....!" ইন্দ্রানী সাড়া দেয়।

- "তারপর কাকা বুড়ো কই? ওকে দেখছি না যে।"

- "আরে বুড়োর দুষ্টমির কথা আর বলো না। কোথায় যে লুকিয়েছে। ডেকে ডেকে আসে না...."

- "সে কি কথা! কতক্ষণ পাচ্ছেন না ওকে?"

- "তা হবে ঘন্টা খানেক ....."

- "আপনারা সব জায়গায় খুঁজেছেন?"

- "ও প্রায়ই এরম দুষ্টমি করে। আবার নিজেই বেরিয়ে আসে খানিক পরে।"

- "না না কাকা এটা ভালো কথা নয়। আপনাদের বাড়ি থেকে বের হলেই রাস্তার দুপাশে দুটো পুকুর। বর্ষার পরে ছাপাছাপি জল ভর্তি। অতটুকু ছেলে যদি বিপদ আপদ কিছু হয়ে থাকে!"

ইন্দ্রানী ফুলকো লুচি, তরকারি আর মিষ্টির প্লেট রাখতে রাখতে সব শোনে।

- "এসব কি বলছ শান্তনু! এমন দিনে এসব অলুফুগে কথা বলো না!"

কল্যাণ উঠে দাঁড়ায়। ভয় সেও পেয়েছে এবার।

- "শান্তনু তুমি থাও। আমি ওদিকটা দেখে আসি আর একবার বরং।"

কল্যাণ পায়ে চটি গলিয়ে হন্ হন্ করে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ইন্দ্রানীর চোখে জল। ভয় তার বুক কাঁপছে এখন। সত্যিই তো ছেলেটা অনেকক্ষণ লুকিয়েছে। এতক্ষণ তো লুকিয়ে থাকার ছেলে বুড়ো না। তাহলে কি..... আর ভাবতে পারে না সে।

ভোলা এতক্ষণ সব দেখছিল উঠনে শুয়ে শুয়ে। এবার সে ইন্দ্রানীর কাছে আসে। কাপড় ধরে টানতে থাকে দাঁত দিয়ে।

- "কি রে ভোলা! তুই জানিস ও কোথায়?"

ভোলা কাপড়ে টান দেয় আর একটু করে বাগানের দিকে ছুটে যায় আর ফিরে আসে।

- "কাকিমা আপনাদের কুকুরটা কোনো কাজের না! আমার মামার বাড়িতে একটা কুকুর ছিল জানেন। কি খেয়াল রাখত সে বাড়ির মানুষের। আর হবেই বা না কেন? বিলিতি কুকুর বলে কথা! ওসবের জাতিই আলাদা!....." চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলে শান্তনু লুচিতে আর একটা সুখের কামড় বসায়।

ইতিমধ্যে কল্যাণ ফিরে আসে। চিন্তিত দেখায় তাকে।

-"কি গো?"

-"আশেপাশে সব দেখে এলাম। কিন্তু...."

ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ.....

ভোলা অনবরত ডেকে চলে এবার। আবার ইন্দ্রানীর শাড়ি ধরে টান লাগায় সে তার দাঁত দিয়ে।

-"ভোলা কিছু বলছে। যাও না ওর সাথে..."

এবার ইন্দ্রানী ভোলার পিছনে পিছনে যায়। আগে আগে ভোলা দৌড়ায়। বাগানের কোনায় পরিত্যক্ত গোয়ালঘরের দিকে নিয়ে যায় সে। উঁচু উঁচু ঘাস, আগাছায় ভরা জায়গাটা। কাছে পৌছাতেই দরমার দরজাটার নিচে দিয়ে চটি পড়া এক জোড়া কচি পা দেখা যায়। ইন্দ্রানী দরজাটা ঠেলে খোলে।

একটা পুরনো হাতল ভাঙা বহু পুরনো চেয়ারের উপর বুড়ো ঘাড় কাত করে বসে অকাতরে ঘুমাচ্ছে।

সকাল বেলা ঘুম চোখে এসে লুকানোর ফল।

-"এ-ই যো শু-ন-ছ!" হাঁক পারে ইন্দ্রানী। -"গোয়ালের দিকে এসো একবার।"

কল্যাণ এসে পরে। দুজনেই ফিক করে হেসে ফেলে ছেলের কান্ড দেখে। কল্যাণ কোলে তুলে নেয় ঘুমন্ত ছেলেকে। আর ভোলা বিজেতার মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সাথে সাথে চলে।

কোলে উঠতেই ঘুম ভেঙ্গে যায় বুড়োর। তার বাবা তাকে উঠানে নিয়ে এসে দাঁড় করায়।

বাবার হাতে এখন আবার কাঠের রুলার।

-"কান ধরো বুড়ো।"

বুড়ো খুব লজ্জা পায়। নতুন জামাই বাবুটা কেমন ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসছে। গা জ্বলে যায় তার।

-"বলো আর কখনো এরম লুকাবে? আর সাড়া দাও না কেন তুমি? জানো না আজকে পূজোর দিন। মায়ের সাথে তুমি ঠাকুর-দালানে যাবে!"

কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

-"আর ভোলা কই? ও ব্যাটাও সব জেনে চুপ করে থাকে।"

ভোলা এসে বুড়োর পাশে দাঁড়ায়। কুঁই কুঁই করে মিটিমিটিয়ে চায় সে বাবার দিকে।

-"এদিকে এসো সবাই। খেয়ে নাও জলখাবার। আমার ঠাকুর-দালানে যেতে দেবী হয়ে যাবে।"

ইতিমধ্যে শান্তনু খান আষ্টেক লুচি আর চারটে মিষ্টি পেটে চালান করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

-"কাকা যাই তাহলে এবার। কাকিমার হাতের খেয়ে মন ভরে গেল।"

-"এই তো এলে! আর ঝামেলার মধ্যে তোমার সাথে ভালো করে কথা পর্যালোচনা হলো না। আর একটু বসো বসো।"

-"না কাকা যাই এবার। বুড়োকে একটু সামলে রাখবেন। আমার বাবা হলে কখন রুলারের দু ঘা খাওয়া হয়ে যেত আমার!"

বুড়ো সব শুনে মিটিমিটি হেসে দাঁড়ায়।

-"দাঁড়িয়ে কেন শান্তনুদা। বসুন না।"

-"আচ্ছা, বসছি।" চেয়ারে বসতে বসতে সে বলতে থাকে,

-" এই শোন তুই বাবা, মায়ের এমন অবাধ্য কেন রে? এত বদমাইশি কেন করিস? মায়ের কথা শুনবি। বাবাকে শ্রদ্ধা করবি। যা স্নান করে..... ওরে বাবা রে.....!"

শান্তনু চেয়ারে বসতে যায় আর বুড়ো পিছন থেকে আস্তে করে চেয়ারটা সরিয়ে নেয়। ফলে ভূ-মধ্যে ধপাস করে সজোরে আঘাত করে তার পশ্চাৎদেশ!

-"গেলাম রে! কোমড়টা গেল আমার....."

বুড়ো এবার ছুট লাগিয়েছে। সাথে ভোলা। আর পেছনে কাঠের রুলার হাতে তার বাবা। উঠোন পেরিয়ে, বাগান ঘুরে সদর দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায় পর পর তিনজন। ঢাকের তালে তালে পুকুরের চারপাশ দিয়ে চক্কর কাটতে থাকে বাপতে ছেলেতে। এর মধ্যে খালি কটা কথাই কানে আসছে....

-"একবার হাতে পাই তোকে। তোর পিঠে ঢাক যদি না বাজিয়েছি আজকে, শালা! তাহলে আমি তোর বাপই নই ....."

# TEARS OF JOY

## MOUSUMI SINHA

Mother: "My dear son, today we are going to meet a famous lady who will tell us so many interesting stories of her life"

Son: "Mamma, what is famous?"

Mother: "A famous person is known to most of us for doing a great job."

Son: "I don't know her, so how can she be famous?" (After a pause) "No I will not listen to her boring stories, rather I will play with my friends over there."

Almost after two hours while returning back home after having a conversation with her...

Son: (Seemed to be deeply engrossed in a thought) "Mamma, I also want to be a famous person like that auntie. When I will grow up, will you buy me a bike like hers so that I can also go to different countries riding on my bike?"

Mother: (with a shaken voice) "You need a lot of bravery for doing that."

Son: (making his eyes bigger) "Yes mamma, I am very brave, I can easily do that."

This was the conversation between me and my son after having met Smt. Lipika Biswas, an Indian Railways employee under whose apparent austere simplicity lies a strong fervour for travel and adventure. Yes, she could immensely impress even a six-year-old boy by her exciting escapades and breath-taking experiences. She was also six years old when she first tried to lift the heavy backpack of her elder brother who is a renowned mountaineer. To her, this bag was not only full of heavy essential stuff needed for mountaineering, but it was full of countless dreams, innumerable hopes and unknown fears. At that age, she started nurturing the dreams of climbing the hard rocks, accumulating the hopes of reaching the top of the world, mustering the courage to vanquish all fears.

Days passed; years passed. The fire of passion she ignited in her heart long ago never got extinguished. In 1994, at the age of 26, she got a job at Indian Railways. The dream which lay latent for so many years started blooming out, spreading out their wings. She spent a few years for collecting loans from different places as these kinds of mountain expeditions are very expensive.

After 20 years in 2014, she started her journey of reaching the highest point of the world - The Mount Everest. The journey was not so easy, fraught with many insuperable impediments at every step. After having done a long and tedious trekking for several days, she with her companions eventually reached the Everest Base camp at 17,600 ft. They had to stay there for a few days before starting their journey for the Everest. In the deep darkness of every night when her companions used to fall asleep or were enjoying the warmth inside the tent, she used to come out and with an inexplicable awe in her eyes stand in front of the snow-clad, gigantic Himalayas. What a magnificent beauty! What a splendid creation of nature! Her long cherished dream came true. Even amidst the biting cold (-30 degree Celsius) she could not resist herself from enjoying this heavenly sight to her heart's content. But who knew that a horrible danger was lurking behind that apparent beauty? Who knew that nature who enthralled them by her majestic loveliness would overwhelm them by a repulsive ruthlessness in no time? A monstrous avalanche hit the basecamp with all its destructive power. People started running helter-skelter helplessly, aimlessly. Some of them had to yield to nature's appalling wrath and fury.

In the next sunlit morning, everywhere was calm and quiet. There was no trace of the last night's dreadful devastation, except a few corpses were scattered here and there. She lost some of her companions. 16 sherpas also died on spot. She came back, desolate, heart-broken. A deep despair engulfed her.

But who can stop her who has dreamt of reaching the zenith of the world? So again, next year in 2015, with a new energy and enthusiasm she set out for the mountains. This time she was more determined, more dauntless. Nature could not allure her by her bewitching beauty. Rather every time she was cautious of impending danger and imminent death. Her eyes were beaming with the hopes of conquering the Everest. But there is a proverb, "Man proposes, God disposes". Again nature involved the mountaineers in an unequal combat where she became more merciless, more heartless than before. On 25<sup>th</sup> April at 11.56 (Nepal Standard Time) Nepal was struck by a devastating earthquake that triggered a massive avalanche at the base camp. Still she shudders at the thought of the disastrous aftermath caused by this earthquake (in Richter Scale its magnitude was 7.8 to 8.1). It killed nearly 9,000 people and injured 22,000 people in Nepal. As a silent spectator, she witnessed the bodies of so many wretched sherpas being carried away. She could not help but shut her eyes in utmost fright when she saw that the head of the Japanese lady with whom she made friends last night and who had a predilection for shampooing her head before every climbing, was totally mangled by a big rock. She herself was also on the verge of death. But God saved her miraculously.

Not only mountaineering, Ms. Biswas is also an eminent cyclist. In 2011, she cycled from Kulu to Khardungla ( Ladakh) a record so far as registered in Limca Book of Records. She is also the first Indian woman from the Eastern zone to complete Audux cycling where she completed a journey of 600 kilometres only in 40 hours! Many people do not know that she is a patient of osteoarthritis and out of 10 only her 7 fingers are functional. Despite having all these physical challenges, her profound love for adventure has maddened her again and again, compelled her to forsake the comfortable warmth of home, prepared her to set off for the unknown.

However, keeping aside all the horrible experiences of conquering the Everest, she again concentrated on her old passion, bike riding. In 2018 she decided to explore Europe riding on her bike. She is the first Indian woman to do a solo cycling expedition across Europe covering Germany, Belgium, Netherlands, Denmark, Norway, Sweden and Iceland. She had no predetermined plans of what to eat, where to stay. She had only courage to face all the formidable obstacles that would come in her way. While cycling across the unknown lanes of Europe, she experienced so many things which were etched in her memory deeply. She will never forget the sincere cordiality of a German couple who offered her to stay at their house for a night when she could not manage to stay in a hotel as it was beyond her budget. She will always remember those days when she lost her ways in the labyrinth of the streets of Europe and those nights when she spent sleeplessly under a tent in the midst of anxiety and uncertainty. But every morning the serene beauty of Europe made her oblivious of all about the previous nights and gave her a new impetus to move on. After a few days she reached Netherlands, 'a land of bicycles'. She was surprised to see that all Dutch cities are well connected by cycle- paths (fietspaden). During her stay in Netherlands, she paid a visit to Indian Embassy and met the Ambassador, Mr. Venu Rajamony. We had a golden opportunity to meet her at our friend's place. In the course of conversation, my eyes suddenly caught sight of her ears which were bedecked with two tiny bicycles. I was completely flabbergasted to see her deep passion for cycling. Almost two hours we were with her and simply got spellbound to hear her fearless feats. Her life is not only an unprecedented tale of valour and intrepidity but also a source of inspiration for those who believe that traveling is an intense intoxication that can never be subdued by age or any other restrictions. When we bade her goodbye, some drops of tears trickled down her cheeks with a beautiful smile on her face. Our heartfelt wishes will always be with her not for wiping these tears but for shedding these tears as each of them will tell the stories of her joy, victory and success.

# রঙ্গমঞ্চ-বহতা স্মৃতির কোলাজ

## প্রাণেশ চ্যাটার্জী

আমার অনুজ ও ভ্রাতৃপ্রতিম অগ্নিভ হঠাৎ একদিন যোগাযোগ করে বললে 'দাদা তুমি নাটক নিয়ে একটা লেখা দাও আমাদের e-ম্যাগাজিনে'। অনুরোধটি পেয়ে বেশ ভালোই লাগলো, অনেকদিন হল লেখা-লেখি চুলোয় গিয়েছে, সুতরাং এহেন প্রস্তাব, তাও আবার নাটক নিয়ে লেখা - এ ছাড়া যায় না। নাঃ, কোনো তাস্বিক লেখা লিখছি না, এমনকি নাটকের ইতিবৃত্ত নিয়েও এ লেখা নয়। চেষ্টা করছি কিছু কোলাজ দিয়ে একটা আকর্ষণীয় কিছু লেখার। তাই প্রথমেই একটি বিশেষ ঘটনার কথা দিয়ে শুরু করি।

নাটকের শেষ দৃশ্য। কারারুদ্ধ বৃদ্ধ পিতার কাছে দুর্বিনীত পুত্র ক্ষমা চাইছে। পুত্রের কাতর আবেদনে পুত্রের সব দোষ ভুলে সেই ছোটবেলার মতোই পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন পিতা। মিলনের সেই মহান মুহুর্তে উজ্জ্বল এক ঝলক আলো এসে পড়লো স্নেহাতুর বৃদ্ধ পিতার মুখের ওপর। দর্শকবৃন্দের করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত। হঠাৎ প্রত্যেকের গোচরে এলো পিতার ভূমিকাভিনেতার মুখে বিরক্তির কুঞ্জনরেখা। দর্শকমন্ডলী বোঝার আগেই সমাপ্তির যবনিকা নেমে এলো। গ্রিনরুমে এসে দাড়ি খুলতে খুলতে সেই বৃদ্ধ পিতার ভূমিকাভিনেতা ড্রেসারকে হুকুম করলেন 'একবার লাইটম্যানকে ডেকে পাঠাও!' খবর পেয়ে দৌড়ে এসে তটস্থ লাইটম্যান জিজ্ঞেস করলো 'কি বলবেন বলুন'। বৃদ্ধের ভূমিকাভিনেতা মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে বলে উঠলেন 'শেষ সিনে বাঁ দিকের কপালের কোণে একটা শেড পড়লো কেন?' কথাটা শুনে লাইটম্যান তো আকাশ থেকে পড়লো। বললো, 'তাই কি করে সম্ভব! আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নি।' আয়নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ফুঙ্ক কণ্ঠে অভিনেতাটি বললেন 'তার মানে তুমি বলতে চাও যে আমি মিথ্যে বলছি?' লাইটম্যান তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চেয়ে 'দেখছি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এলো কিছুক্ষণ পরেই, এসে মাথা নিচু করে জানালো 'লাইটের গ্লাসের এক কোণে সরু মতন একটা স্ক্যাচ পড়েছে'। অভিনেতাটি ঘাড়ে-গলায় ওডিকোলন লাগাতে লাগাতে বললেন 'তোমার মাইনের খাতায় ওরকম যদি একটি স্ক্যাচ পড়ে তাহলে তোমার কেমন লাগবে? এর পর থেকে প্রতিটি শোএর দিন সকালে এসে প্রত্যেকটি গ্লাস নিজে পরীক্ষা করে যাবে'। এই অসাধারণ অভিনেতাটি হলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের নটসূর্য - অহীন্দ্র চৌধুরী।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের আদিপুরুষ এবং স্রষ্টা, বাংলা ভাষায় প্রথম নাট্য অনুবাদক হলেন রাশিয়ান নাট্যকার গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ। অধুনা বাংলায় লেবেদেফকে মনে রেখেছেন ক'জন? এই লেবেদেফকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র নির্মাণের মহতী প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা ছিল উৎপল দত্ত মহাশয়ের যা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, সফলকাম হয় নি। তবে লেবেদেফের হাত ধরে এবং তার পরবর্তী সময়ে আরো অনেক গুণীজনের সুচিন্তায় ও কঠিন পরিশ্রমে 'অলীক কুনাট-রঙ্গ' মজে থাকা বঙ্গদেশ ও বাংলার নাট্যশালা অনেকটা পথ বেয়ে আজ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আজকাল নাটকের উপস্থাপনা ব্যঞ্জনাময় ও প্রতীকী, সেখানে গল্পের নির্মাণ ও বিনির্মাণ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অভিনব। খুব ছোটবেলায় যাত্রা দেখেছি, সে স্মৃতি বড়োই হালকা। নিজেরই লেখা বিভিন্ন উপন্যাসগুলিকে নিয়ে শৈলেন ঘোষ মহাশয় প্রতি বছর কলকাতার 'শিশুরঙ্গনে' একটি করে নাটক করাতেন, প্রতিবার দেখতে যেতাম, কারণ আমার ছোড়দি ওই দলের সদস্য ছিল। দৃশ্যপটের পরিবর্তন, অভিনয়, আলো-ছায়ার মায়াবী খেলা, পর্দার ওপার থেকে ভেসে আসা রহস্যময় শব্দবলয় পুরো পরিবেশটা মুহুর্তের মধ্যে পাল্টে দিতো, এক কল্পলোক রচনা করতো। এরপর আমাদের ইস্কুলে খরাজ মুখার্জির (আমাদের থেকে তিন বছরের সিনিয়র) টুকরো-টাকরা মজার অভিনয়, গান, কনসার্টে নাটক করা - এসব লেগেই ছিল নিয়মিত। আমাদের সঙ্গেই একই শ্রেণীতে পড়তো কমলেশ্বর, নাটকের প্রতি তার একটা ঝোঁক ছিলই, সেই সঙ্গে আমাদের অনেকেরই ছিল, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আজ স্বনামধন্য মঞ্চাভিনেতা। পরবর্তীকালে (ইস্কুল জীবনের পরে) কমলেশ্বরের কালীঘাটের বাড়িতেই নাটকের রিহার্সালে আসতো আরো অনেকে - পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, কৌশিক গাঙ্গুলী, কৌশিক সেন, চুণী গাঙ্গুলী, ... এরা সবাই আজ প্রথিতযশা। কাছাকাছি থাকার জন্য যেতামও মাঝে-মাঝে। আরো অনেক বছর পরে নেদারল্যান্ডসে এসে এক নাট্যব্যক্তিত্বকে পেয়ে যাই - তিনি 'চার্বাক' এর সৌম্যদা (সৌম্য সেনগুপ্ত), এখানে দুর্গাপূজার সময় করালেন উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' (২০১০ সালে), এবং করালেন 'রক্তকরবী'। তারপর থেকে প্রতি বছরই পূজায় নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকলো।

মনের সুখে সেসব নাটকে অভিনয় করতাম, নির্দেশনার কাজ করতাম। অনতিবিলম্বে, 'মজলিশ নেদারল্যান্ডস' নামের একটি গ্রুপ থিয়েটার তৈরি করে নেদারল্যান্ডসে ও কলকাতায় নিয়মিতভাবে, এবং মাঝে-মাঝে UK তে শো করা শুরু হলো। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকলো বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয়ে তৈরি স্মৃতিরৈখিক দৈর্ঘ্য। মঞ্চে উঠে প্রথম সিনেই ওপেনিং ডায়লগ ভুলে গিয়ে থম মেরে যাওয়া সহ-অভিনেতা, আনকোরা অভিনেতাদের হাতে-কলমে সব শেখানো, প্রবীণ অভিনেতার উত্তেজনার বশে স্ক্রিপ্ট নিয়ে মঞ্চে ঢুকে তা আবার মাঝ-মঞ্চে থেকে কায়দা করে উইংসের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া, পাঁচ-পাতার স্ক্রিপ্ট একলাফে টপকে যাওয়া অভিনেতাকে আবার নিজের সংলাপে ফেরত আনানোর বিশেষ 'প্রম্পটারি' কায়দা - এসব অনেক কথা জমে আছে। স্বল্প পরিসরে এসব বলার সুযোগ কোথায় ! নাটক ভীষণভাবে দর্শকমুখী কিন্তু তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করার সব দায়ভার একান্তভাবেই নাট্য-পরিচালকের। পরিচালক যার জন্য যতটা গালিচা বিছিয়ে দেবেন মঞ্চে ওপর, সেই নির্ধারিত অঞ্চলেই নিজের বসতি তৈরি করে কেরামতি দেখাতে হবে কলা-কুশলীদের। এ এক সমষ্টিগত প্রয়াস, এক সুশৃঙ্খল ও পরিশ্রমী দলের উপস্থাপনা, যার অভিনব দর্শক-শ্রোতাদের প্রতিনিয়ত বিমোহিত করে রাখে। মনে প্রাণে চাই বেঁচে থাকুক মঞ্চনাটক। বাস্তব জীবনের প্রতিফলন ঘটে মঞ্চে, মঞ্চ আমাদের অনেক কিছু ভাবতে শেখায়, এ শুধুই সপ্তাহান্তের হালকা বিনোদন নয়। শারদোৎসব উপলক্ষ্যে এই লেখা, তাতে বাঙালিদের প্রতি ঘরে পৌঁছে যাওয়া সেই মহান মানুষটির কথা থাকবে না তা কি হয়! নমস্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র - বেতার সম্প্রচারণার বাইরে তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল নাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক হিসেবে। কত অভিনেতাদের তিনি যে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাদের এগিয়ে দিয়েছেন, অনেককেই একেবারে ঘষে-মেজে পুরোদস্তুর মঞ্চ-চরিত্র বানিয়ে ছেড়েছেন তার ঠিক নেই।

পরিশেষে কামনা করি, নাটকের প্রতি বাঙালির ভালোবাসায় যেন ঘাটতি না থাকে। নাটক সমাজের দর্পণ। মানুষের চেতনা জাগিয়ে তুলতে, প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করতে, দিশা দেখাতে এ এক মস্ত হাতিয়ার। সবাই এগিয়ে আসুক, অংশগ্রহণ করুক নাটকে। দুর্গাপূজোর দিনগুলি সবার বড় আনন্দে কাটুক, সবার অন্তরের অন্তঃস্থলে ফুটে উঠুক আলোকমঞ্জরী, সমস্ত বিষাদ, দুঃখ, তিক্ততা ভুলে আমরা সবাই চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ী রূপে যেন মগ্ন থাকতে পারি এই কটা দিন।

## সহজভাবে বেঁচে থাকা সহজ

**বিক্রমজিৎ ব্যানার্জী এবং চন্দ্রানী ব্যানার্জী** - বাংলা তথা ভারতীয় সংগীতের অন্যতম দুই নাম। ফিল্মফেয়ারে শ্রেষ্ঠ সংগীত, ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাসরুট গ্রামির্জ-এ দুটো পুরস্কারের পরেও এই দম্পতি মাটির কাছাকাছি থাকতেই ভালোবাসেন। ওনাদের সাথে কথা বললেন **অগ্নিভ সেনগুপ্ত**।

বাংলা গানের ইতিহাসে মহীনের ঘোড়াগুলির পরেই যে কয়েকটা ব্যান্ডের নাম উঠে আসে, তার মধ্যে অন্যতম ক্রশউইন্ডস। এর ইতিহাস সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন..

১৯৯৩ সালে মহীনের ঘোড়াগুলি যখন "আবার বছর কুড়ি পরে" নিয়ে ফিরে আসে, তখন ক্রশউইন্ডস ভারতবর্ষের কলেজ সার্কিটে খ্যাতি অর্জন করেছে। গৌতম চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দেন, এবং "পৃথিবী.."-র জন্ম হয়। তারপর, উনি বেঁচে থাকতে আরো অনেক কাজ একত্রে করেছি।

**ক্রশউইন্ডসের শেষ অ্যালবাম বেড়িয়েছিল ২০১৫-তে। নতুন কোন অ্যালবামের পরিকল্পনা আছে?**

"ঝরা পালক"-এর পরে আর কোন পূর্ণদৈর্ঘ্যের অ্যালবাম প্রকাশিত হয়নি, ঠিক। ডিজিটালি বেশ কিছু একক কম্পোজিশন প্রকাশিত হয়েছে, যা আমাদের শ্রোতারা উপভোগ করতে পারেন। পূর্ণদৈর্ঘ্যের অ্যালবাম নিয়েও পরিকল্পনা চলছে।

**বিংশ শতকের শেষভাগে বাংলায় যে ব্যান্ড-সংগীতের জোয়ার এসেছিল, তা অনেকটাই প্রশমিত। আপনার কি মনে হয়, এর পিছনে কারণ কি?**

যদিও এখন অনেক একক শিল্পীরা সমান্তরালভাবে কাজ করছেন, কিন্তু আমি মনে করি যে ব্যান্ড সংগীত যথাস্থানে তার গুরুত্ব ধরে রেখেছে। এখনো যেকোন কলেজ ফেস্ট ব্যান্ড সঙ্গীত ছাড়া অসম্পূর্ণ।

**আপনারা দুজনেই ভূমি-র সাথে যুক্ত ছিলেন, যাঁদের গান প্রধানত লোকগীতি-নির্ভর। সেখান থেকে ক্রশউইন্ডসে, যা প্রধানত ক্লজ বা জ্যাঙ্গলির্ভর। মিউজিকের দিক থেকে এই দুই ভিন্ন জঁরে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন?**

ভূমি-র সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা খুব সুন্দর। লোকসঙ্গীত নিয়ে আমরা আগেও কাজ করেছি, এবং এখনো কাজ করে চলেছি। ক্রশউইন্ডস কোন বিশেষ মিউজিক্যাল ফর্মে আটকে থাকায় বিশ্বাসী নয়। আমরা জ্যাজ, ক্লজ, রক, ফোক, ফিউশান ইত্যাদি বিভিন্ন জঁরে আগেও কাজ করেছি, এবং ভবিষ্যতেও কাজ করার ইচ্ছা আছে।

**হার্ভি হ্যানকক বা স্কাই হাইয়ের সাথে আপনারা যেমন কাজ করেছেন, তেমন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়েও কাজ করেছেন। আবার, এককালে আবার বছর কুড়ি পরে-তেও এমন এক গানে কাজ করেছেন, যা এখন এক মাইলস্টোন। এই বৈচিত্রময় মিউজিকের পিছনে অনুপ্রেরণা কি?**

আমরা জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গীত নিয়ে কাজ করেছি। স্বাভাবিকভাবেই, আমরা সবকিছু শেখার জন্যেই অনুপ্রাণিত। আমাদের চেষ্টা থাকে, সবসময় নতুন কিছু তৈরী করার। সেই কারণেই, শ্রোতারা আমাদের কাছে প্রত্যেক সময়েই আশা রাখে নতুন কিছু শোনার জন্যে।

**বাঙালী মেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আই-এ-এস, আই-পি-এস ইত্যাদি হতে পারে, তা আগেও দেখা গেছে। কিন্তু, আপনি প্রথম দেখিয়েছিলেন যে বাঙালী মেয়েরা রকস্টারও হতে পারে। এই অনুপ্রেরণার সূত্রপাত কি ভাবে?**

ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি শিখেছি। পাশাপাশি বিটলস্, চেট অ্যাটকিন্স, অ্যান মুরের গানের ভক্ত ছিলাম। যখন ক্রশউইন্ডসের হয়ে প্রথম স্টেজে উঠি, তখন ব্যান্ডের জগতে মেয়েরা পদার্পণ করেনি। দর্শক এবং শ্রোতাদের থেকে আপত্তি তো দূরস্থান, বরং অজস্র ভালোবাসা পেয়েছি। এখন যখন দেখি যে অনেক মেয়েরাই ব্যান্ডে গান গাইছে, ভাবতে ভালো লাগে যে তাদের জন্যে সেই দরজা খুলতে আমার সামান্য ভূমিকা আছে। আমার অনুপ্রেরণা পেয়েছি জনি মিচেল, ক্যারোলি কিং, বিলি হলিডে, সুজানে ভেগার থেকে।

বহু ভাষায় গান গেয়েছেন। গানের সব কথা বুঝতে অসুবিধা হতো না? কিভাবে প্রস্তুতি নিতেন?

আমরা মূলত ত্রিভাষিক ব্যান্ড। বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজীতেই গান গেয়ে থাকি। তার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায় গান গাইতে, এবং ভারতের বিভিন্ন উপভাষায় সঙ্গীতের উপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালো লাগে। আইসিসিআর থেকে আমাদের যখন ভিয়েতনাম পাঠিয়েছিল, তখন ওখানে দূতাবাসে আমি ভিয়েতনামিজ ভাষায় গান গাই। শো-এর পরে ভিয়েতনামের সৈনিকরা ব্যক্তিগতভাবে আমার উপস্থাপনার প্রশংসা করেছিল, যা আমাদের কাছে এক বিশাল প্রাপ্তি।

অন্য ভাষায় গান গাইতে হলে আগে ধ্বনিগতভাবে গানটা তুলে নিয়ে অনবরত তার চর্চা করতে থাকি, যতক্ষণ না সেটা নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে।

তোমাকে বুঝি না প্রিয়-র জন্যে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। গ্রাসরুট গ্রামিজ-এ দুটো বিভাগে পুরস্কার। কিন্তু, প্রচারের আলেয় খুব-একটা থাকেন না। শিল্পী বড় হওয়ার সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাদের অহংকার বহুগুণ বেড়েছে, যা আপনাদের ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপস্থিত। এই সিম্পল লিভিং এন্ড হাই থিঙ্কিং-এর দর্শনটা যদি একটু বিস্তারিতভাবে আমাদের পাঠকদের জানান..

অনেক ধন্যবাদ। পুরস্কার অবশ্যই মূল্যবান, কিন্তু তার থেকেও মূল্যবান হচ্ছে আমাদের শিল্প, আমাদের সৃষ্টি। গ্রাসরুট গ্রামিজ-এ অ্যাওয়ার্ড পাওয়া যদিও এক বিশেষ মুহূর্ত, শুধুমাত্র আমাদের জন্যে নয়, গোটা দেশের জন্যে।

সহজভাবে বাঁচাটাই সবথেকে সহজ বলে মনে হয়। নিজেদের জন্যে, এবং আমাদের সৃষ্টির জন্যেও।

## লাউয়ের টর্চ আর ট্রেন টিকিটের গল্প

পলাশ সাহা

সবাই মিলে থাকে সেই একাল্লবর্তী অতি মধ্যবিত্ত পরিবার। ঠাকুমা, মা-বাবা, কাকারা, কাকিমারা, ভাই ও বোনেরা, দু একজন অতিথি, দু একজন কাজের লোক নিয়ে জনা ১৫-20 জনের সাবেকি বাঙালি পরিবার। দুই ব্যাগ ভরে রোজ বাজার আসতো, মাছের ব্যাগ আলাদা। কখনো কখনো দেখতে পেলে দৌড়ে গিয়ে কাকার বা বাবার হাত থেকে ব্যাগ টা এগিয়ে আনা।

বাজার এর ব্যাগ থেকে প্রায়ই একটা লাউ উঁকি মারতো। লাউ গুলোও ছিল যেন একাল্লবর্তী পরিবারের জন্য তৈরী - সে মস্ত বড় একটা, এখন আর খুব একটা দেখি না, হয়তো ওরাও ছোট হয়ে গেছে।

ঠাকুমা এক ঝুড়ি সন্ডি কাটতে বোসতো একটা বটি নিয়ে। এক আবদারেই লাউ এর বোটাটা একটু লাউ সম্মত কেটে হাতে দিতো, আর সেটাই হতো সারাদিনের খেলার টর্চ। বাবা কলকাতায় গিয়ে ফিরে এসে হাতে দিতো দুটো ট্রেনের টিকিট - আর সেই টিকিট দুটো নিয়ে কত খেলা সবাই মিলে, ট্রেন-ট্রেন, বাস-বাস, স্টেশন মাস্টার, পু ব্লিক ব্লিক আরো কত কি।

একটু বড় হলে বাবার কাছে, কাকার কাছে অনেক আবদার একটা ক্রিকেট ব্যাট কিনে দেবার, অনেক ঘুর ঘুর করে না পেয়ে অবশেষে অন্যকে দিয়ে বলানো, শেষ মেশ না পেয়ে একটু ইনোভেটিভ হওয়ার চেষ্টা - সাহস করে বাবাকে বলেই ফেলা, বাড়িতে যে কাঠ মিস্ত্রী কাজ করছে তাকে দিয়ে একটা ব্যাট বানিয়ে দাওয়ার কথা। ইনোভেটিভ এপ্রোচ টা কাজে দিয়েছিলো, অবশেষে বাবা রাজি, মিস্ত্রী কাকুকে বললেন কয়েক ঘন্টা দরজা জানালার কাজ বন্ধ রেখে একটা ব্যাট বানিয়ে দিতে। যথারীতি কাজ শুরু হলো 'ব্যাট বানানো', সে কি আনন্দ - সারা দিন লেগে রইলাম মিস্ত্রী কাকুর সঙ্গে একদম সক্রিয় সহকারীর মতো, যন্ত্রপাতি এগিয়ে দেওয়ার থেকে চা, বিস্কুট সবকিছু। তবে দিনশেষে যেটা তৈরী হলো সেটা অনেকটা 'মুগুর' এর মতো দেখতে, কোনো ভাবেই ব্যাট বলা চলে না। এখন ভাবি একজন কাঠ মিস্ত্রী কিভাবে এহেন পরিশ্রম করে একটা 'মুগুর রুপী' ব্যাট বানিয়ে ফেললো। যাইহোক, ব্যাট 'মুগুর রুপী' তো কি হয়েছে - বল তো মারা যাবে, আর তাতেই খুশি - ভীষণ খুশি সেই ব্যাট নিয়ে, যেন স্বপ্ন হয়ে পাওয়া।

আজ সেই লাউ এর টর্চ, ট্রেন এর টিকিট নিয়ে খেলা, মুগুর ব্যাট দিয়ে বল পেটানো, ছোট ছোট জিনিস গুলো দিয়ে অনেক বড় বড় আনন্দ পাওয়া হয়তো সেই একাল্লবর্তী পরিবারের মতোই হারিয়ে গেছে।



# আবাহন

## তনিমা চ্যাটার্জী

বেশ কিছুদিন হল তিতির পড়তে চলে গেছে জার্মানিতে। বাড়িটা হঠাৎ করেই বড় ফাঁকা হয়ে গেছে। অপালার এতদিনের ব্যস্ততার রোজনামচা স্তব্ধ হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে কি করে যে আঠারোটা বছর কেটে গেল ! ছোট তিতিরও বড় হয়ে অন্যদেশে পাড়ি জমালো। নিস্তব্ধ চারিদিক, বেশ রাত হয়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর তমাল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। অপালার ঘুম আসছে না কিছুতেই। বিছানা থেকে উঠে পাশে তিতিরের ঘরে গেলো। ফাঁকা ঘরে ঢুকতেই হ হ করে উঠলো মনটা। এ তো হবার কথাই ছিল, তার জন্য যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতিও ছিল। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলো অপালা। এদেশে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে অন্য দেশে যদি নাও যায়, মা বাবাকে ছেড়ে আলাদা বাড়িতে থাকে। এতে এত কষ্ট পাবার কি আছে! একদিন তো অপালাও এসেছিল তার আপনজনদের ছেড়ে, নিজের দেশ ছেড়ে। তখন মন খারাপ হয়েছিল খুব। তারপর ধীরে ধীরে এই ছেড়ে থাকাটাই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। তিতিরের ঘরের পেছনের জানলার পর্দাটা সরতেই হাইওয়ের অ্যাপ্রোচ রোডটা চোখে পড়লো। নিস্তব্ধ চারিদিক, হাইওয়ের আলোগুলোই শুধু জীবনের স্পন্দন জোগায়। পিছনের সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোও গভীর ঘুমে অচেতন। এই জানলা দিয়ে দেখা বাইরেটা আজ কেমন যেন অচেনা লাগল অপালার। প্রায় এগারো বছর আছে এই বাড়িতে, কখনো এত রাতে এই জানলায় এসে দাঁড়াবার সুযোগ হয়নি। এ যেন এক অন্য শহর। তিতির রাত জেগে পড়াশোনা করতো বলে, ওকে বিরক্ত করেনি কখনো। এদেশে ছেলেমেয়েরা বড় হলে তাদের নিজস্ব 'চক্রবৃহৎ' তৈরী হয়ে যায়। সে পরিসীমার মধ্যে মা- বাবার বিচরণ নিয়ন্ত্রিত। আর এটাই মা-বাবার জন্য মাহেন্দ্রক্ষণ নিজের জগত তৈরী করে নেবার। তমাল তো তবু ব্যস্ত থাকে নিজের অফিসের কাজ নিয়ে, কিন্তু অপালার তো সেই 'রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা'র জীবন। জীবনের প্রতিদিনের বাঁচাটা এতদিন নিজের অজান্তেই কখন অন্যের ইচ্ছের দাস হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ভাবে গানকেই আবার নতুন সঙ্গী করবে, কিন্তু হয়ে ওঠে না কিছুতেই। বিয়ের পর কিছুদিন অল্প করে হলেও গানের চর্চাটা বজায় রেখেছিল অপালা, কিন্তু তাদের জীবনে তিতিরের আগমনের পর থেকেই থমকে গিয়েছিল এসবের চর্চা। মেয়েকে ঘুম পাড়ানোর সময় গুনগুন করে দুকলি গাইতে পারার মধ্যে শুধু জিইয়ে ছিল শখটা। তারপর কেটে গেছে প্রায় আঠারোটা বছর। অপালা যে গান গাইতে পারে তা সে নিজেই ভুলতে বসেছে। যখন কোনও গানের অনুষ্ঠান হয়, বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে, গলা মেলাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। বহুদিনের অনভ্যাস যে। যদি বেসুরো হয়ে যায়, লোকে যদি হাসে, যদি ব্যঙ্গ করে ! তিতিরকে গান শেখানোর খুব ইচ্ছে ছিল, তিতির শিখতে চায়নি। এসব দেশে ছেলেমেয়েদের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তাই অপালার সে স্বপ্নও অধরা থেকে গেছে। তবুও তিতিরের জন্য একটা ভালো পিয়ানো কিনেছিল, যদি কখনও শখ হয় এই ভেবে। একতলার স্টাডিরুমে রাখা আছে সেটা। রিডগুলোয় ধুলো জমেছে, কতদিন যে হাত পড়েনি এতে। অপালা ধীর পায়ে নীচে নেমে এল যাতে তমালের ঘুম না ভেঙে যায়। পিয়ানোর চাবিতে হাত দিতেই সুরেলা মূর্ছনায় চারিদিক ভরে উঠলো। গলা মেলানোর চেষ্টা করলো অপালা। সুর লাগাতে গিয়ে গলাটা একটু কেঁপে গেল। একে বহুদিনের অনভ্যাস, সঙ্গে এক অজানা সঙ্কোচ। দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ল আজ তো অক্টোবরের ছ'তারিখ, তার মানে আজই তো মহালয়া। কোলকাতায় সব বাড়ির রেডিওতে এতক্ষণে বেজে উঠেছে মহিষাসুরমর্দিনী, শুরু হয়ে গেছে গঙ্গার ঘাটে তর্পণের প্রস্তুতি। হঠাৎই সব দ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে রেখে, চারদিকের নিস্তব্ধতা চুরমার করে খোলা গলায় অপালা গেয়ে উঠলো "বাজলো তোমার আলোর বেণু"। এই উৎসবের আবহে সঙ্গীতের হাত ধরে অপালা নিজের শর্তে নতুন জীবনকে আবাহন করলো আজ।

# INTEGRATION: FINDING YOUR 'CLOGS'

CHAITALI SENGUPTA

Life for the immigrants in their adopted land is a life poised between the two cultures. It is about carrying with them a hybrid identity, which in my opinion, is never complete, never whole, but always fragmented. Living for almost a little more than twenty years in the Netherlands, I have often been asked questions like: what are your experiences of living between two cultures? Are you fully integrated? How different have been your experiences?

Honestly speaking, I do not have all the answers yet. And I still have not stopped seeing many things through the lens of my 'Indian eye'. As a result, almost two decades later, I still find myself on a learning curve, (or on a learning 'bike'!) as far as integration is concerned!

## Language

'Why don't the immigrants learn Dutch if they want to live here?' is one of the sentiments often expressed by the friendly natives, even though the Dutch people are rather comfortable English speakers. I'm sure, occasionally, the same thought must have crossed your minds too! The Netherlands is, in fact, one of the most English friendly countries in the mainland Europe, yet if one plans to settle down here, learning the language makes a lot of sense. But is it that simple?

Learning the language takes a long time. Besides, it is not a very easy language to master, what with its difficult grammar, (sometimes) confusing word order, difficult pronunciation, its fascination with split verbs, its reliance on exceptions rather than rules, the local dialects, those untranslatable words, and those contextual words that have more than one meaning! So '*het weer*' can mean the weather, but '*weer*' without the article '*het*' means again! Yes, it is rather difficult for beginners to speak this language. It is not helped by the fact that your Dutch friends, neighbors, or colleagues would switch into English as soon as they hear you speak Dutch- they do not want to miss the chance of practicing their English with you! So, learning Dutch is almost like starting with a new fitness regime, but it truly pays off, once you have learnt it! Go for it, I would say! Doe maar!

## Dutch Culture

But then, integration is much more than only learning the language at a language school. True, learning the language enhances your employability in this land, it brings that elusive sense of 'belonging' to the land as you speak the native tongue. But how do you deal with Dutch culture? Of course, the Netherlands has its own unique set of customs and etiquette. And you, as a foreigner, would need a bit of acclimatization with the customs.

'Didn't you have any culture shocks when you came to live here?' is a question my Dutch teacher Ria van den Broek had once asked me over '*een lekker kopje koffie*'! Yes, of course, and there were plenty. The foremost being that the **Coffeeshops** were not really 'coffee shops' where you might end up, snug cozily, enjoying a warm cuppa. Those were small places where you might go to buy weed products! I remember Ria's amusement when I expressed my discomfiture in discovering that!

## **Weather**

My Indian bones still feel rather challenged by the weather here, for it changes increasingly and within a span of twenty-four hours, you may end up experiencing the sun, the rain, and the wind! No wonder that the Dutch call their country as 'kikkerland' (a land of frogs), for it is cold, raining and mostly wet. The first phrase that my Dutch teacher Ria taught me regarding the weather was: "*Slecht weer bestaat niet, welke slechte kleding*" roughly translated it meant: "Bad weather doesn't exist, it is only those unsuitable clothing." But my Indian bones, so used to the warm, sunny climates, struggled hard for years before giving in to this nugget of wisdom. Dutch love to talk about their weather, so tackling the weather the Dutch way is also going to be a part of your integration here!

## **Aren't they too direct?**

Talk about the famous 'Dutch Directness'. For many of us, in our first few years, (even later!), our initial experiences with Dutch directness probably came as a shock. The very direct approach of our Dutch colleagues, neighbors, and friends requires some adjustment. The blunt opinions, might seem to be 'offensive', 'arrogant' or even 'inconsiderate', depending on which culture one is coming from, but one needs to understand that the one thing the Dutch absolutely dislike is to be pretentious, and this directness has everything to do with their intrinsic straightforwardness and transparency. They would, in return, expect you to be honest and open with them too. It is a different way of communication, and that too, very much like the language and the weather, shall need time to get used to! But once you learn to communicate in the direct way, who knows, you might end up liking it!

There are a few other aspects of Integration too, but to keep it short, I would say integration is a lot about learning and unlearning. Not everything will be to your liking in the new land you have chosen to settle in. Even after several years of living here, you would still be comparing your life and situations here and back home.

In the transition phase, we all probably would commit a few (amusing!) 'Culture follies', but those are also fun moments, and armed with the new language you have learnt, and with your understanding of the Dutch culture, you would surely find your 'clogs' (I mean, footing!) in this multicultural country.

# ভারতীয় মার্গসঙ্গীত ও বর্তমান প্রজন্ম

## লিপিকা ভট্টাচার্য

অনেকের মতে, বর্তমান প্রজন্মের প্রযুক্তিনির্ভর কার্যকলাপে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সনাতনী ধারা, কৌলিন্য ও আভিজাত্য আজ যেন তার স্বরূপ হারাতে বসেছে। পাশ্চাত্য সুরের অন্ধ অনুকরণ ও নানাপ্রকার সংস্কৃতির মিশেলে গড়ে ওঠা ব্যাকরণহীন সুর তালের ভয়ঙ্কর দাপটে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের গভীরতা ও আধ্যাত্মিকতা যেন অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে --- অর্থাৎ, এবার নতুন ভাবনাচিন্তা করার সময় এসেছে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে, আজ আধুনিক সঙ্গীতের সমাজে যে চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা' কিন্তু কালের বিবর্তনবাদ, প্রথাগত শিক্ষার অভাব ও উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। তাই বর্তমান প্রজন্মের এ হেন রুচিগত ও আচরণগত পরিবর্তনের জন্য সমাজ কিন্তু তার পরোক্ষ দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারেনা। আজকের পৃথিবী আগের তুলনায় অনেক বেশী গতিশীল। বিজ্ঞানের কল্যাণে সারা পৃথিবীর সঙ্গীত এখন হাতের নাগালের মধ্যে এবং তাদের পারস্পরিক তুলনা, পরীক্ষামূলক ব্যবহার ও অনুকরণের সুযোগও বর্তমান প্রজন্মের সাধের আওতায়-- তাই হরেকরকম কোলাজের মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্ম এক নববিস্ময়সৃষ্টিকারী পরশপাথর সন্ধানে ব্যাকুল যার মাধ্যমে অতি সহজেই পৌঁছান যাবে সাফল্যের চূড়াটিতে যেখানে যশ, সম্মান, খ্যাতি, অর্থ ও আধুনিক বিলাসবহুল জীবনযাত্রার এক বিচিত্র সমাহার অপেক্ষমান।

এই লক্ষ্যস্থির-এর মূল্যবোধই সমস্যার মূল উৎস। কারণ সাফল্যের মাপকাঠি কিসের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে--পার্থিব সুখ না আধ্যাত্মিক শান্তি? এই সিদ্ধান্তগ্রহণের ভূমিকা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের ভিত্তি কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যা' জ্ঞান ও বৈরাগ্যভিত্তিক চিরন্তন আনন্দের সন্ধান দেয়। সেই আনন্দপ্রাপ্তির জন্য আজকের প্রজন্মকে পার হতে হবে সঙ্গীতের প্রথাগত শিক্ষার এক দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পথ যার অন্য নাম "অনন্ত সাধনা"। কঠিনতম এ সাধনার পথে সম্বল শুধু অসীম ধৈর্য, সৈর্য এবং আকর্ষ পিপাসা। শ্রীমদভগবত গীতার ধ্যানযোগ-এর একটি শ্লোকে এই সাধনার বর্ণনা লক্ষিত হয় :-

“ যথা দীপো নিবাতস্বো নেপ্ততে সোপমা মৃত্যু  
যোগীনো যতচিত্তস্য যুদ্ধজতো যোগমাস্তনঃ”

বাতাস না লাগা দীপশিখার মতই সাধকের চিত্ত হবে স্থির, অচঞ্চল ও ধ্যানমগ্ন। পরম ভারতীয়তার প্রাচীন সনাতনী রূপ প্রকাশিত হয় শ্লোকটির মধ্য দিয়ে। কিন্তু বাস্তবের প্রেক্ষাপটে এই সাধনাসিদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, আজকের পৃথিবীতে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরই এক অলিখিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়, তার শৈশব-কৈশোর পার হয়ে যায় পুঁথি-পুঁজির বিশাল কার্যক্রমে ঠাসা এক ক্লাস্তিকর পথের ইঁদুর-দোড়ে ছুটে ছুটে.....এতটুকু পিছিয়ে পড়লে তার মনের নীল আকাশ হতাশার কালো মেঘ ঢেকে যায়, তার বিদ্যুতের ঝলকানি অপরিপক্ব হৃদয়টিকে ক্ষত-বিক্ষত করে যায়। অবশেষে একদিন সাফল্যের ধ্বজা তুলে সে চড়ে বসে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সোনার তরীটিতে ও পাড়ি দেয় অবশিষ্ট জীবনসমুদ্রের পথে। এই পার্থিব পরম পাওয়াটুকুর জন্য তার আক্ষরিক শিক্ষার প্রয়োজন হলেও দীক্ষার প্রয়োজন হয়না। তাই তার মূল্যবোধও গড়ে ওঠে নিজের আবর্তটুকু ঘিরে সেই পরিধির সীমারেখা পর্যন্ত। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের ব্যাপ্তি ও সীমাহীন আনন্দলাভের উপলব্ধি থেকে সে বঞ্চিত হয়, কারণ তার মূল্যবোধের সংজ্ঞা ভিন্ন। আজকের সমাজই তাকে সীমিত মূল্যবোধ সম্বন্ধে শিক্ষিত করে। পঞ্চাশতাব্দে, অন্য একটি সমস্যাও প্রকট হয় যা হল প্রাচীন ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের প্রতি আজকের প্রজন্মের আকর্ষিত না হওয়া। এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা অত্যন্ত জরুরী। কারণ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাচীনকাল থেকে গুরুকুলের ঘরানাকেন্দ্রিক অনমনীয় মনোভাব সমস্যাটির অন্যতম কারণ বলা যায়। তাই সাধারণ জনজীবনে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠেনা, থেকে যায় কয়েক যোজন দূরে। যুগ যুগ ধরে এই পরম সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে থাকে আপন সীমানায়, তার চৌহদ্দি পেরিয়ে আমজনতার প্রথাগত শিক্ষা কার্যক্রমে প্রবেশ করতে পারেনা। প্রাচীন ভারতের মহার্ঘ্য ধনটি তাই থেকে যায় বর্তমান প্রজন্মের ধরাছোঁয়ার বাইরে, তার দিশা না পেয়ে কালের উত্তরসূরীরা হাতড়ে বেড়ায় আধুনিক প্রযুক্তিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংক্ষিপ্ত পথ, খুঁজে ফেরে পরশপাথর।

এ প্রসঙ্গে এক বিখ্যাত নোবেলজয়ী বাঙালীর কথা মনে হয়। নাম তাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সমসাময়িক সময়ের মেলবন্ধন গড়ে যিনি তৎকালীন ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, টপ্পাঙ্গের গানের শব্দচয়নে একদিকে যেমন ছুঁয়ে গেলেন মানবহৃদয়ের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভূত আবেগের ঢেউ, অন্যদিকে তেমনই একই সৃষ্টির সুরে রেখে গেলেন ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের স্বমহিমা, গভীরতা, প্রশান্তি! তাই হতাশাই শেষ কথা নয়। আজকের প্রজন্মই প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরসূরী, ধারক ও বাহক। তাই বর্তমান প্রজন্মকেই সাজিয়ে তুলতে হবে নবরূপে! একদিকে বিশ্বায়নের যুগে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বভাতৃস্বের ডাক, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের সনাতনী রূপরেখাও ফুটিয়ে তুলতে হবে সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে। আদিরূপের সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে নবরূপে! পুঁথিগত কার্যক্রমের সমান্তরালেই বেঁচে থাকুক মার্গসঙ্গীতের প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি, পরস্পরের পরিপূরক হয়েই সম্পূর্ণ হোক বৃত্ত, যে বৃত্ত থেকে নির্গত অনন্ত অমৃতধারার দ্যুতি প্রবাহিত হোক ব্যক্তি থেকে সমাজে, সমাজ থেকে দেশে, দেশ থেকে সমগ্র বিশ্বে! হোক সেই মহামঞ্জের আয়োজন, যে যজ্ঞে “আত্মপ্রদর্শন নয়, সত্য প্রদর্শন”--এই মহামন্ত্রে চেতনা জাগ্রত হোক, যজ্ঞের হোমানলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, পাশ্চাত্য-মার্গসঙ্গীত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের ঘটাহতি অর্পিত হোক বর্তমান প্রজন্মের মাধ্যমে, ভিন্ন ভিন্ন নদীরূপে তারা মিশে যাক একই আধ্যাত্মিকতার গভীর সমুদ্রে ---দূষণমুক্ত সংস্কৃতির ধারা ছড়িয়ে যাক আকাশে বাতাসে... সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীতেই যুগে যুগে কালে কালে প্রাচীন ভারতীয় সনাতনী রূপরেখার ধারা বেঁচে থাকুক তার স্বমহিমায়!



ঋদ্ধিনন্দা বৈদ্য, ১০ বছর

Riddhi

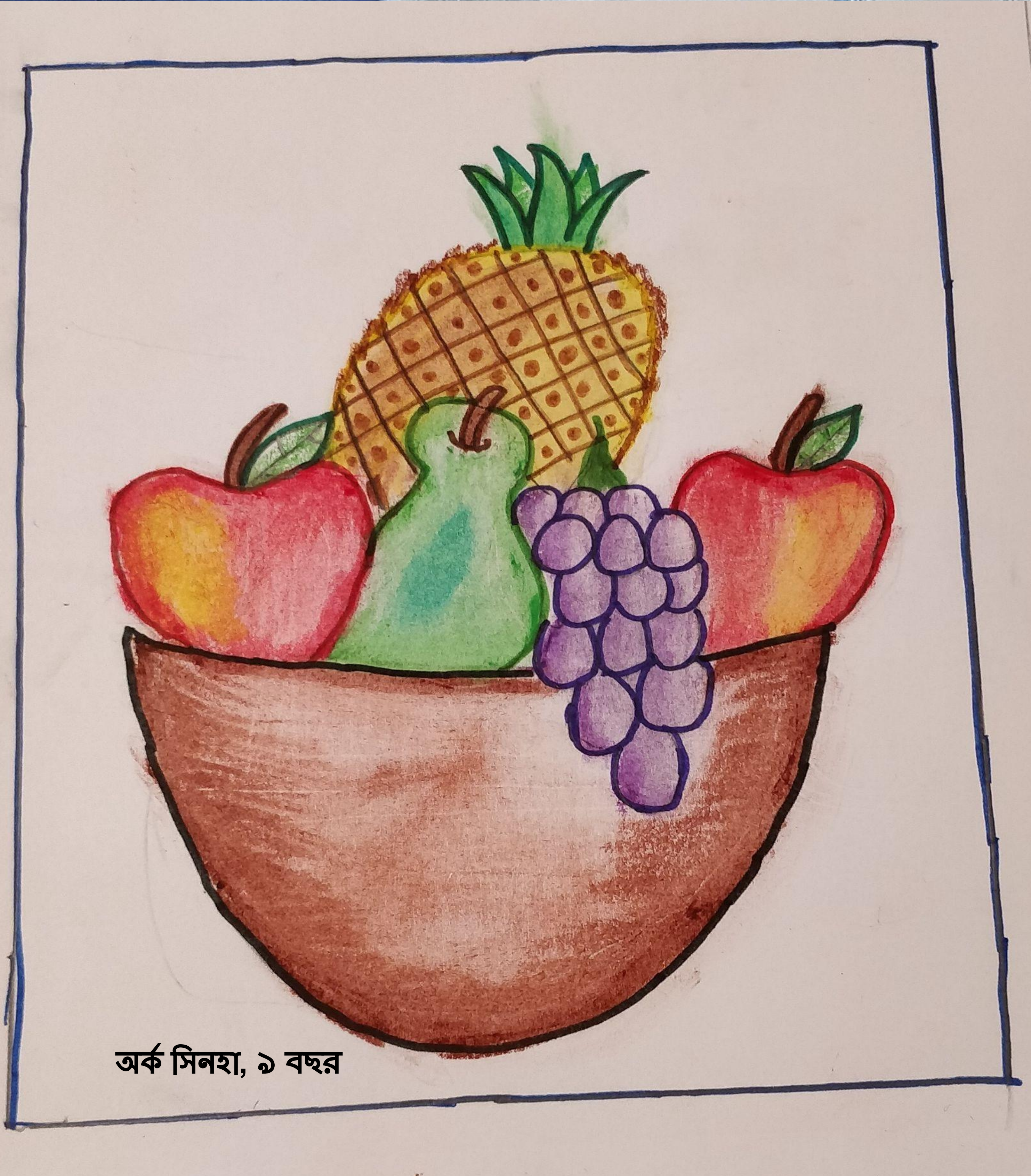
दिशान नाथ, ६.५ বছर



अर्क सिनहा, १ বছर



অদিতি সেনগুপ্ত, ৯ বছর



অর্ক সিনহা, ৯ বছর



# A NEW WORLD BECKONS

UTALIKA  
THE CONDOVILLE

All images are Artist's Impressions

## LUXURY PHASE IV



SAVOUR A NEW WORLD THAT'S RIGHTFULLY YOURS

Welcome to Utalika Luxury, a world where large open spaces, luxurious greenery, a pristine private lake, serpentine floral gardens, spacious apartments, a plush club and futuristic amenities embrace you. And the unmistakable Ambuja Neotia signature brings assurance, and trust follows.

Be a connoisseur of this new world.

**AmbujaNeotia**

Call: 91 96745 07997

Visit [utalikaluxury.com](http://utalikaluxury.com)



Project approved by



and other leading bodies



Download the  
Utalika app

A Project of Bengal Ambuja Housing Development Limited  
(A JV Company of West Bengal Housing Board & Ambuja Neotia Group)  
Developed by S.E. Builders & Realtors Limited (Subsidiary of Bengal Ambuja Housing Development Limited)  
Ecospace Business Park, New Town, 700160 IP +91 35 4848 8301 P +91 35 4848 8181  
W [www.ambujanetia.com](http://www.ambujanetia.com) | E [utalikaluxury@ambujanetia.com](mailto:utalikaluxury@ambujanetia.com)

Disclaimer: Information, images and visuals displayed in this advertisement are the architect's impression and only indicative of the proposed development, subject to approval from local authorities.

HIRA/P/SOU/2018/00041 | HIRA/P/SOU/2018/00042 | HIRA/P/SOU/2018/00043 |  
HIRA/P/SOU/2019/00051 | [www.ambujanetia.com](http://www.ambujanetia.com)